শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য
শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
করকমলেষু

বিহার

এই লেখকের অন্যান্য বই

পূর্বপার্বতী। সিন্ধুপারের পাখি। নাগমতী। নোনা জল মিঠে মাটি। তটিনী তরঙ্গে। অন্তরঙ্গ। দূরের বন্দর। তাসের মিনার। নতুন দিন। রূপসীর মন। মাটি আর নেই (যন্ত্রস্থ)।

পুব থেকে উজান ছোটে, ঢলক নামে পশ্চিমে।
উত্তব থেকে ভাঁটান আসে, টান ধরে দক্ষিণে।

ধলেশ্বরীর মিঠেন জলে উজান-ভাটির লহর খেলে।

রসিক স্বজনেরা বলে, উজানিয়া গাঙ, মাতানিয়া নদী। উজানে মাতন, ভাঁটানে জিবান। উজানে নদী উথল পাথল। তখন তার ঢলে কত ঢলানি। ভাটিতে নদীর দশা বড় করুণ, তখন তার জলে নিঝুম তরতরানি।

উজান-ভাটিব স্রোতে দিবারাত্রি তুফান ভাঙে।

কতকালেব এই ধলেশ্বরী।

এ নদীব হয়ত একটা ইতিহাস আছে। পুঁথি-পুরাণে এর গৌরব-গবিমাও হয়ত মিলতে পাবে।

দুই তীরে মোগল-পাঠানেব কত বরুজ-গম্বুজ চোখে পড়ে। দর্পী সেনাপতির কত দুর্গপ্রাকার দেখা যায়। সাধু-পীর-ফকিরের কত দরগা-দেউল যে আছে, লেখাজোখা নেই। কাল তাদের জরা ধরিয়েছে। ধলেশ্বরী তাদের ভেঙেচুরে বিনাশ কবে চলেছে।

পুবনো আমলের মানুষেবা বলে, ধলেশ্বরীর দুই তীরে মোগল-পাঠানের কত লড়াই হয়েছে। সেনাপতির সিংহনাদে, ঢাল-তলোয়ারের ঝনঝনায় মাটি কেঁপেছে। ছিপ নৌকায় বহর সাজিয়ে এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বীরপুরুষের রক্তে নদীর জল লাল হয়ে উঠেছে।

এ সব কথা নাকি পুঁথিপুস্তকে আছে। বীরপুরুষের যে রক্ত পুঁথির পাতায় রেখ্ কেটেছে, ধলেশ্বরীর কোথাও তার একবিন্দু খুঁজে পাওয়া যাবে না। কালে আর জলে সব ধুয়ে মুছে গিয়েছে।

সে কাল নেই। মোগল-পাঠান নেই। সাধু-পীর-ফকির নেই। ঢাল-তলোয়ারের ঝনঝনা নেই। সেকালের কেউ নেই, কিছুই নেই।

মানুষ যায়, তার পিছে পিছে দর্প যায়, অহঙ্কার যায়। তার মহিমাও চিরকাল থাকে না। আজকের কথা কাল ইতিহাস হয়ে যায়। ইতিহাস থাকে গল্পে-গাথায়, পুরাণে-পুঁথিতে। তার সঙ্গে বর্তমানের প্রত্যক্ষ যোগ কোথায় ?

ধলেশ্বরীর তুই তীরের বাসিন্দারা পুঁথিপুস্তকের কড়ি ধারে না। মোগল-পাঠান নিয়ে মাথা ঘামায় না। জীবিকার ধান্দায়, জীবনের এলোপাথাড়ি লড়াইতে তাদের দিবানিশি কাটে। শৌখিন চিন্তার অবসর কোথায় তাদের ?

তবু এটুকু তারা জানে, দিন যায়, আজকের মানুষ কাল আর থাকে না। একে একে কালে কালে সবই যায়। কিন্তু ধলেশ্বরী থাকে।

ধলেশ্বরী তীরের মানুষগুলির একটি মাত্র জীবন। বর্তমান নিয়েই তারা ঝালাপালা, বিব্রত। হাজার ধুন্ধুমারে তাদের দিন কাটে।

ধলেশ্বরীর শুধু বর্তমানই নেই। তার তিন কাল আছে। অতীত আছে, ভবিষ্যৎও আছে। তুর্জ্ঞেয় ভাষায় নদী অবিরাম তিন কালের কথা শোনায়। দিবানিশি ঢেউয়ের অক্ষরে তুই কূলে কি যে লেখে, কে বোঝে।

দিন যায়, মাস যায়, ঋতুচক্রে সময় পাক খায়।

সুদিনের মানুষ তুর্দিনে বদলায়। কিন্তু ধলেশ্বরীর বদল নেই। তার সুদিন তুর্দিন নেই। সব দিনই সমান।

তুই তীরের বরুজ-গম্বুজ খসে খসে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কিন্তু ধলেশ্বরীর বিনাশ নেই। মাতানিয়া গাঙ, জিরানিয়া নদী চিরদিন একই থাকে, একই খাতে বয়, একই মেজাজে চলে।

বাহারের নদী ধলেশ্বরী।

সাধের সওয়ার নিয়ে পাকা মাঝি উজান-ভাটিতে পাড়ি জমায় ব্যাপারীদের বিরাট বিরাট ভাউলে পশ্চিমা বাতাসের টানে টানে ভেসে আসে। আর আসে হাজার মণী মহাজনী নৌকার বহর। পালের পাখ্‌না মেলে সব দূর দূর গঞ্জ-বন্দরে চলে যায়।

নিশিরাতে জিরানিয়া ঘাট থেকে 'গহনার নাও' ছাড়ে। রসুনিয়া, বাজিতপুর, ইনামগঞ্জ, গিরিগঞ্জ, কোণাখোলা, বরিস্থর পিছে ফেলে কোথায় যে সে উধাও হয়!

ধলেশ্বরীর বুকভরা স্রোতে কত নামের কত ধমের নৌকা যে ভাসে, তার হিসাব কে রাখে? কোষ, ভাউলে, গাওয়ালী, ডিঙি, পানসী, একমাল্লাই, দোমাল্লাই, কেরায়া, গহনা—সব মিলিয়ে হিসাব দুই হাতের দশ আঙুল ছাপিয়ে যায়।

কত জাতের কত ধাতের নৌকাই না আসে! সারিগানের নৌকা, ঢপের নৌকা, পালাযাত্রার নৌকা, বেবাজিয়ার নৌকা, বেদেবস্তির নৌকা, গাথকবাদকের নৌকা—কত যে, তার লেখাজোখা নেই।

ধলেশ্বরী ছোটবড় কোন নৌকাই ডুবায় না। সবই তার কাছে সমান। সব নৌকার জন্যই তার বুকে অফুরন্ত মমতা। অতি সন্তর্পণে, অতি আলগোছে নৌকাগুলিকে সে নিজের বুকে ভাসিয়ে রাখে।

ধলেশ্বরী কারুকেই প্রাণে মারে না। সে যে বাহারের নদী। তার বুকে হিংসা নেই, কুটিলতা নেই, খলতা নেই।

দুই তীরের বাসিন্দাদের মাটির ভাগ নিয়ে কত না বিবাদ। কিন্তু ধলেশ্বরীর ভাগ নিয়ে কোন বিবাদ নেই। শরিকে শরিকে তালুক মুলুক নিয়ে কত না বিসম্বাদ। কিন্তু নদী নিয়ে কোন বাদ নেই। নদীর সঙ্গে কোঁদল খাটে না। জারিজুরি চলে না।

ধলেশ্বরীর উপর সবার সমান মালিকানা। মাতানিয়া গাঙ জিরানিয়া নদী সকলের খাস দখলে। মাটি কাটলে ভাগ হয়, জল কাটলে কি দাগ পড়ে?

ধলেশ্বরীর দুই পারের চিত্রটি বড় মনোরম। ঋতুতে ঋতুতে তাদের রূপ বদলায়। বৈশাখ মাসের খরায় দুটি রিক্ত, নিঃস্ব তীর খা-খা করে। ভরা বর্ষায় তাদের অন্য রূপ, অন্য মেজাজ। শিশুধানের লাবণ্যে তখন দুই পার ছাপাছাপি। হেমন্তে ক্ষেতের ঝাঁপি মধুগন্ধি ফসলে ভরে যায়। ফাল্গুন চৈত্রে রবিশস্যের মরশুম। তিল কলাই মুগ মটরের ফুল ফোটে এ সময়। নানা ফুলের নানা রঙে নক্সিকাটা আঁচলের মত দুটি তীর পড়ে থাকে।

ঋতুতে ঋতুতে ধলেশ্বরী দুই পারে আপন খুশিতে ছবি আঁকে।

পাল-পার্বণে, উৎসবে-পরবে, জন্ম-মৃত্যুতে—সব তাতেই নদীর প্রয়োজন। জলসইতে যাবে, পরবাসীর সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতাবে, দূর দেশে নাইওর যাবে—কোনটাতে নদীকে না হলে চলে? শোক-দুঃখ, সুখ-উৎসব, সব কিছুর নির্লিপ্ত সাক্ষী এই ধলেশ্বরী। এই নদী দুপারের বাসিন্দাদের আনন্দ-বেদনার নিরাসক্ত অংশীদার।

নদীতে খেলে উজানভাটির ঢেউ। মানুষের জীবনে খেলে সুখ-দুঃখের ঢেউ। ধলেশ্বরীর উজানভাটির ঢেউয়ে মানুষের সুখদুঃখের ঢেউ মিশে যায়।

দুই তীরে ঢালী-মালী, কাহার-কুমার, মালো-যুগী, মৃধা-নিকারী, ছত্রিশ জাতের বাস। তাদের কথা ইতিহাসে থাকে না। পুঁথিপুরাণে তাদের খোঁজ মেলে না। এই সব দুঃখী, অন্ত্যজ মানুষগুলিকে দুই তীরে সুখাশ্রয় দিয়ে ধলেশ্বরী অবিরাম বয়ে চলে। বুঝি বা ঢেউয়ের দুর্জ্ঞেয় ভাষায় নিশিদিন তাদের কথাই বলে। দুই তীরে দুর্বোধ্য অক্ষরে তাদের কথাই লেখে।

॥ আখ্যান ॥

॥ এক

নদীর নাম ধলেশ্বরী ;
থাকেন জলে মীনেশ্বরী ।
চলক উজায় উত্তরে ;
বায় নামায় দক্ষিণে ।
চলক ভাটায় পুবে ;
কোটাল খেলায় পশ্চিমে ।
ধলেশ্বরী নদীর বাখান আছেন পুরাণে ;
ধনে জনে বাড়ে মনিষ্যি, যেই জনা শোনে ।

ধলেশ্বরীর তীরে জিরানিয়া ঘাট। জিরানিয়া ঘাটে কত কাল আগে যেন এক সারিগানের আসর বসেছিল। সারির দলের গায়ক আসর বন্দনা করতে উঠে গীতটা বেঁধেছিল।

গায়কের নাম আজ আর মনে নেই। কিন্তু ধলেশ্বরী পারের বাসিন্দারা গীতটা আজও ভোলে নি। গীতটা মনে বড় রেখ্ কেটেছে।

ভরা কোটালের নদী।

দুই তীর ছাপিয়ে মাতানিয়া গাঙ খল খল করে ছুটেছে। দহে দহে উজানী স্রোত পাক খায়।

বাহারের নদী ধলেশ্বরী। তার কোটালে ভয় নেই। তার বুকে যত ঢেউ তত রঙ্গ। তার স্রোতে যত উজান-ভাটি, তত মাতামাতি।

ধলেশ্বরী নৌকা ডুবায় না। ঢেউয়ের মাথায় তুলে সামান্য নাকানি-চুবানি দিয়ে পাকা মাঝির পরাণে বুঝি বা ভয় ধরায়। মাঝি কিন্তু ভয় পায় না। কঠিন মুঠায় হাল ধরে বেসামাল নৌকা বাগ মানায়। ধলেশ্বরীর স্বভাব তার জানা।

মাঝির দশা দেখে কোটালের নদীর রঙ্গ বাড়ে, টান বাড়ে, খলখলানি বাড়ে। রঙ্গেই ধলেশ্বরীর যত সুখ!

এখন বিকাল।

পশ্চিম তীরে সূর্যটা ঢলে পড়তে শুরু করেছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সোনার বর্ণ রোদ চিকিমিকি করে।

এক ঝাঁক কাটৌরা পাখি উত্তর থেকে দক্ষিণে আড়াআড়ি পাড়ি জমায়। ছোট ডানায় বড় আকাশ মাপতে মাপতে হয়রাণ হয়ে তারা বাতাসে ভাসতে থাকে। তাদের ছায়াগুলি ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খায়।

সময়টা ফাল্গুনের প্রথম। খোলা নদীর বাতাসে শীতের আমেজ এখনও মিশে আছে।

কোটালের মুখে একটা নৌকা তরতর করে এপারের দিকে আসছে। দিন তিনেক আগে সুজন মাঝি সওয়ার নিয়ে ওপারে গিয়েছিল। এ নৌকা তার।

নদীর পারে এক সার হিজল গাছ। হিজলের ডালপালায় জিরানিয়া ঘাটে অনেকখানি ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে। নৌকাটা সেখানে এসে ভিড়ল।

নৌকার গলুই থেকে পারের মাটিতে নামল সুজন মাঝি। পাথরে খোদাই কালো মূর্তি। রুক্ষ, খসখসে চামড়া থেকে খই ওড়ে। মাথাটা ধবধবে সাদা। সাদা মাথায় একটা কালো চুলের কলঙ্কও নেই। গলায় তিন লহর তুলসীর মালা।

সুজন মাঝি ভক্তজন, কৃষ্ণমন্ত্রী। ধলেশ্বরীর পারে নেমেই সে নাম নেয়, 'রাধে কিষ্ণ, রাধে কিষ্ণ—'

জিরানিয়া ঘাটে আরো দুটি নৌকা বাঁধা ছিল। নৌকা দুটি রসিক ঢালী, উদ্ধব ঢালী—দুই ভাইয়ের। উদ্ধব বড়, রসিক ছোট। নৌকার গুরায় বসে দুই ভাই তরিবত করে নেশা করছিল। তেজী তামাকের উগ্র গন্ধে জিরানিয়া ঘাটের বাতাস মদির হয়ে আছে।

সুজন মাঝির গলা পেয়ে সাধের নেশা টুটল।

উদ্ধব বলে, 'তালুই যেন ?'

'হ।'

'ফিরলা কখন ?'

'এই তো আসলাম।'

'সওয়ার নিয়া গেলা তিন দিন আগে। ফেরার নাম নাই। এত দেরী করলা ক্যান ?'

'সওয়ার নামাইয়া নানান্ খানে গেছিলাম।'

উদ্ধব বলে, 'সওয়ার নিয়া তো গেলা তালুই। একদিন যায়, দুইদিন যায়, তিন দিনও যায় যায়। কিন্তু তুমি ফের না। তিন দিন তোমার বিরহে মাউইর কি দশা! তা যদি দ্যাখ তালুই, মাউইর দুঃখে পরাণ ফাটে।'

'তার দুঃখুটা কিসের ?'

'দুঃখু হইব না! মনখান কি তোমার পাষাণ তালুই। মাউইর ডর, নদীর উই পারে তুমি কোন যৈবনবতীর মায়ায় পড়ছ।'

'তামাসা করিস না বান্দর (বাঁদর)।'

কথায় কথায় উদ্ধবের নৌকার কাছে এগিয়ে আসে সুজন মাঝি। বলে, 'নদীর ঐ পার থিকা গেলাম নন্দনপুরের খলায়। সেইখানে আমার বিয়াই বাড়ি। বিয়াই খাওয়াইল বড় জবর। মাগুর মাছের ঝোল, চিতলের কোল, রুই মাছের মাথা। পাত ক্ষীর আর সবরি কলা।'

শুনতে শুনতে রসিক ঢালী, উদ্ধব ঢালী—দুই ভায়ের চোখ চকচক করে।

সুজন মাঝি বলতে থাকে, 'বিয়াই বাড়ি থিকা কোণাকুণি পাড়ি দিলাম উত্তরে। গেলাম স্বরূপ নগরের হরিসভায়। সেই জায়গা বড় পুণ্যির থান। সেইখানে গৌরাঙ্গসুন্দরের ধাম। আমাগোর (আমাদের) জলের ছ্যাশের মথুরা বিন্দাবন।'

দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকায় সুজন মাঝি। দেখাদেখি রসিক উদ্ধবও কপালে হাত তোলে।

সুজন মাঝি আবার বলে, 'স্বরূপ নগরে লীলাপালা হইল। ছ্যাশের ভক্তজনায় সেইখানে আসছেন। সকলে গায়, সকলে নাচে। দিন যায়, রাইত আসে। আবার দিন যায়, তবু লীলাপালা থামে না। দেখতে দেখতে তিনটা দিন কোনখান দিয়া যে গেল।'

তিন দিন পর ফেরার জন্য ক্ষোভ নেই, খেদ নেই, চিন্তা নেই সুজন মাঝির। আনন্দে তার মুখখানা মাখামাখি। অপরূপ এক খুশিতে তার চোখ ঝিকমিক করছে।

উদ্ধব ডাকে, 'নৌকায় আস তালুই। এট্টু নেশা কইরা যাও। এত বড় মাতানিয়া গাঙ পাড়ি দিয়া আসলা—'

'না রে, অখন না।'

'আরে আসই। কাল ইনামগঞ্জের হাট থিকা বাহারের তামুক আনছি। ভাল কইরা এক ছিলুম সাজি ?'

হঠাৎ বড় উতলা হয়ে উঠল সুজন মাঝি। বলল, 'কথায় কথায় কত অপরাধ করলাম। নৌকায় আমার গৌরাঙ্গসুন্দরেরে বসাইয়া আসছি। যাই—যাই—'

রসিক ঢালী এবার কথা বলে। তার গলায় তাজ্জবের স্বর ফোটে, 'গৌরাঙ্গসুন্দর কে গো তালুই ?'

'আয় আয়, দেখবি আয়। বজের ব্রজের) শুকপাখি নিয়াআসছি।' নিজের একমাল্লাই নৌকাখানার দিকে চলতে চলতে সুজন মাঝি বলে।

রসিক ঢালী, উদ্ধব ঢালী—দুই ভাই হুঁকা-কল্‌কি নামিয়ে নৌকার গুরা থেকে পারে নামে।
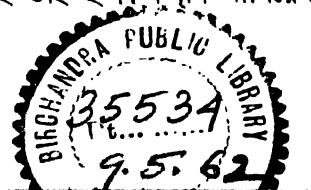
সুজন মাঝির নৌকার মাঝখানে বেতপাতার ছই। ছইয়ের নিচে এক অপরূপ কিশোর। গোরা গোরা রঙ, কিশোরীর ছাঁদে চূড়োবাঁধা চুল। ভাসা ভাসা ঢুলু ঢুলু চোখ। গলায় তিন লহর তুলসীর মালা।

সুজন মাঝি আত্মহারা হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুগ্ধ গলায় বলে, 'আহা, সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গসুন্দর—'

রসিক ঢালী, উদ্ধব ঢালী—দুই ভাই সুজন মাঝির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রসিক বলে, 'পরবাসী গোরাচাঁদ আনলে কোথা থিকা গো তালুই?'

দুই হাত ঘুরিয়ে সুজন মাঝি বলে, 'সবই তেনার (তাঁর) কৃপা। গোবাচাঁদই গোরাচাঁদ মিলাইয়া দিল।'

॥ দুই ॥

দুটি কিশোরী মেয়ে নদীর স্রোতে সই পাতানির চৌয়ারি ভাসাতে এসেছিল। একজনের নাম সুবাসী, অন্যজন রঙ্গিলা। সুবাসী-রঙ্গিলা—দুই কিশোরী আজ সই হল।

নদীতে কলার মান্দাসের চৌয়ারি ভাসিয়ে দুই সই গায়—

সইয়ের সোয়ামী সইয়ের পুত,
ভইরা (ভরে) থাক সইয়ের বুক।
ঘরের পিরীত মনের সুখ,
মাইখা (মেখে) থাক সইয়ের বুক।

গীত গাওয়া শেষ হলে দুই সই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

সুবাসীর গালে টুসকি মেরে রঙ্গিলা রঙ্গ করে। বলে, 'বিয়াই হইল না, সইয়ের বুকে সোয়ামীপুত ভইরা (ভরে) থাকব কেমনে ?'

সুবাসী বলে, 'আ লো সই, সরমের মাথা খাস যে। চুপ কর। মা-খুড়িরা আছে না ? শুনব।'

লজ্জার একটি রঙ আছে। সুবাসীর মুখ সেই রঙে লাল হয়ে ওঠে।

আজ বড় সুখের দিন।

মালীর মেয়ে সুবাসী, আর ঢালীর মেয়ে রঙ্গিলা ধলেশ্বরী সাক্ষী রেখে আজ সই পাতাচ্ছে। আকাশ বাতাস, চরাচর সাক্ষী রেখে পরাণে পরাণ গাঁথছে। বাকী জীবন সুখে-দুঃখে তারা এক থাকবে।

দুই সখীর মা এসেছে। আত্ম-বান্ধবেরা এসেছে। শরিকেরা

বিবাদ ভুলে এসেছে। শিশু-বুড়ো-যুবায় ধলেশ্বরী পারের জিরানিয়া ঘাট ভরে গিয়েছে।

আজ বড় সুখের দিন।

সুবাসী রঙ্গিলা ঢালী-মালীর মেয়ে। হত তারা সওদাগরের ঝি, হত তারা রাজার ঘরের দুলালী, নদীর ঘাটে বাদ্যবাজনা আসত, ঢোল সানাই আসত, কাঁসি-ডগর আসত। চরাচর জানত, রাজার ঘরের দুলালী আর ধনপতি সওদাগরের ঝি আজ সই পাতায় গো।

সুবাসী রঙ্গিলা ঢালী-মালীর ঘরের ঝি। বাদ্য-বাজনা, ঢোল সানাই কোথায় পাবে তারা ?

তবু তো উৎসবের দিন। হোক ছোট ঘরের ঝি। তাই বলে কি পরাণে সাধ জাগে না ! সখ থাকে না !

সুবাসী-রঙ্গিলার বাপ দুই সইকে দু-খানা নতুন কাপড় কিনে দিয়েছে। নতুন কাপড়ে নানা রঙের বাহার। ডোরা ডোরা রেখ্-কাটা শাড়ি।

কিশোরী মেয়ের চিকন মাজায় দশ হাতি শাড়ি সামাল দিয়ে রাখা সহজ কথা না। মাজায় তিন বেড় দিয়েও কাপড় মাটিতে লুটোয়।

চৌয়ারি ভাসিয়ে নদী থেকে উপরে উঠে আসে দুই সই। ফিস ফিস করে রঙ্গিলা বলে, 'চিকণ মাজায় কাপড় যে সামলাইতে পারি না, খালি খুইলা খুইলা (খুলে খুলে) যায়। কবে মাজায় ভার আসবে লো সই ?'

সুবাসী বলে, 'পোড়ামুখী, তোর সরম নাই।'

ধলেশ্বরী পারের কিশোরী মন বড় তাজ্জবের বস্তু। আট বছরে সেই মন সব বোঝে। দশে পড়লে সেই মনে উজান-ভাটি খেলে। এগারতে ঢল নামে। তেরোতে সেই ঢলে কত ঢলানি।

ধলেশ্বরী পারের কিশোরী আর তার মন নদীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তরতরিয়ে বাড়ে।

মাঝিঘাটা খানিকটা দূরে। মাঝখানে তুটো রবি ফসলের মাঠ। মাঠের পর সারি সারি হিজল গাছ। হিজল গাছের ছায়ায় মাঝিঘাটা।

প্রথমে সুবাসীর মায়ের চোখে পড়ল। সুবাসীর মায়ের নাম ফুলটুসি। ফুলটুসি এই গ্রামেরই মেয়ে, আবার এই গ্রামেরই বউ। সে হল সানাই ঢালার ঝি, চন্দ্র মালীর বউ। বাপের ঘর সোয়ামীর ঘর তার একই গ্রামে।

গ্রাম সুবাদে সুজন মাঝি তার খুড়ো।

সুবাসীর মা বলল, 'মা গো মা, তোরা সগলে ছাখ। তিন দিন পর সুজন খুড়া ফিরল।'

সবাই দেখল।

সুবাসীর মা আবার বলল, 'মা গো মা, সুজন খুড়া এই কারে আনল? কি ধলা (ফর্সা)! কি সোন্দর! কি বাহারের রূপ গো!'

বউ-ঝি, শিশু-বুড়ো-যুবা—সবাই দেখল।

হিজল গাছের তলায়, ধলেশ্বরীর পারে, সুজন মাঝির পাশে এক অপরূপ কিশোর। গোরা গোরা রঙ। নাকের ছাঁদ, ভুরু, মুখের ডোল—সব কিছু যেন খোদাই করা।

তিল কলাইর ফুল ফুটেছে। মুগ মটরের ফুল ফুটেছে। নানান ফুলের উজ্জ্বল রঙে মাঠটাকে একখানা নক্সিকাটা আঁচলের মত দেখায়।

শিশু-বুড়া-যুবা, বউ-ঝি—শোর তুলে মাঠের উপর দিয়ে মাঝি-ঘাটার দিকে ছুটল।

সকলের আগে আগে ছুটেছে নতুন পাতানো তুই সই। সুবাসী আর রঙ্গিলা। দশ হাতি নয়া কাপড় চিকণ মাজা থেকে খসে খসে পড়ে। তুই হাতে নয়া শাড়ি দলা পাকিয়ে তুই সই ছুটছে।

মাঝিঘাটায় এসে সুজন মাঝিদের ঘের দিয়ে দাঁড়াল সকলে।

॥ তিন ॥

রসিক ঢালী, উদ্ধব ঢালী—দুই ভাই এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উদ্ধব বলল, 'তালুই কইলা (বললে) না তো ?'

'কী কমু ?'

'পরবাসী গোরাচাঁদরে কোথায় পাইলা (পেলে) ?'

'কইলাম তো। গোরাচাঁদই গোরাচাঁদ মিলাইয়া দিল। গোরাচাঁদ না মিলাইলে পামু, এমুন ভাগ্য আমার না।'

'রঙ্গ রাখ তালুই। সত্য কথা কও।'

'শোন তবে—'

গলায় খাকারি দিয়ে সুজন মাঝি বলল, 'গোরাচাঁদ পাইলাম স্বরূপ নগরে।'

'স্বরূপ নগরে কার ঘর ভাইঙ্গা (ভেঙ্গে) এই রূপ চুরি করলা গো তালুই ?'

'চুরি করি নাই। এ কি চুরি করনের বস্তু! বজবাসী আমার হাতে দিলেন। পর জাতি না; আমাগোর স্বজাতি। আমাগোর ঘরেই থাকব।'

কিশোর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আশ আর মেটে না সুজন মাঝির। মাতোয়ারা হয়ে সে গায়—

আহা, কি দেখলাম একি,
গৌর রূপের ঝিকিমিকি—

গৌর রূপের ঝিকিমিকি বুঝি সুজন মাঝির সরল মুখখানায় খেলে যায়। আনন্দের রসে সে মেতে ওঠে।

শিশু-বুড়ো-যুবারা চারপাশে ঘের দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের ডেকে ডেকে সুজন মাঝি বলে, 'তোরা ছ্যাখ্ গো, আমার গৌরাঙ্গসুন্দরের রূপ ছ্যাখ্—'

উদ্ধব বলে, 'গোরাচাঁদের নামখান কী?'

কিশোর ছেলেটি চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ তুলে সে বলল, 'আমার নাম অনঙ্গ।'

'অলঙ্গ। আহা, বড় সোন্দর নাম।'

'অলঙ্গ না, অনঙ্গ।' অনঙ্গ ভুলটুকু শুধরে দেয়।

উদ্ধব হাসে। বলে, 'তুমি আমাগোর অলঙ্গই। পাপ মুখে কি আর শুদ্ধু নাম বাইর হইতে চায় গোরাচাঁদ!'

এবার সুজন মাঝি বলল, 'আসো গো গোরাচাঁদ, ঘরে চল। গৌরাঙ্গসুন্দর যখন মিলাইয়াই দিল, তখন তোমারে মাথায় রাখুম।'

সুবাসীর মা আর রঙ্গিলার মা নক্সিকাটা মাঠটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা মাঝিঘাটায় আসেনি। সুজন মাঝি সম্পর্কে রঙ্গিলার মার শ্বশুর। রসিক ঢালী উদ্ধব ঢালী সুবাদে সুবাসীর মায়ের ভাসুর। শ্বশুর আর ভাসুরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে দূরে থাকা ছাড়া তাদের গতি কী?

এতক্ষণ সুবাসী আর রঙ্গিলা অনঙ্গকে দেখছিল। রসিক, উদ্ধব আর সুজন মাঝির কথা শুনছিল। এবার দুই সই দুই মায়ের কাছে ছুটল।

সুবাসীর মায়ের মুখেচোখে কৌতূহল ছাপিয়ে পড়ে। সে বলে, 'সুজন খুড়া কারে আনছে লো?'

দুই হাত ঘুরিয়ে, দুই চোখ নাচিয়ে রঙ্গিলা বলে, 'পরবাসী গোরাচাঁদ আনছে। নাম তার অলঙ্গ।'

রঙ্গিলার মাকে ঠেলা দিয়ে সুবাসীর মা বলে, 'মাইয়ার (মেয়ের) ঠিসারার কথা শোন বৌ !'

'তুই শোন। আহ্লাদ দিয়া দিয়া ঠিসারা-ঠমকের কথা শিখাইছিস। এইবার শোন।'

'আমি তো শুনতেই আছি। তুইও শোন।'

বলতে বলতে রঙ্গিলার একখানা হাত ধরে সুবাসীর মা। বলে, 'পরবাসী গোরাচাঁদ কি লো ঠমকী মাইয়া ! ঠমক রাইখা সত্য ক (বল)।'

'সত্যই গো মাসী, পরবাসী গোরাচাঁদ। নাম কয় অনঙ্গ। মাসী গো, পরবাসী গোরাচাঁদ টালুমালু চায়। জিগাও (জিজ্ঞেস কর) সইয়েরে।'

হেসে হেসে ঢলে পড়ে রঙ্গিলা। ঢলে ঢলেই মাঝিঘাটার দিকে ছোটে। পিছে পিছে সুবাসীও ছোটে।

সুবাসীর মা ডাকে, 'রঙ্গিলা, শোন।'

রঙ্গিলার মা বলে, 'আর শুনছে !'

'মাইয়া যেন কেমুন লো বউ ! পরবাসী গোরাচাঁদের কথা কইতে কইতে গেল গিয়া। সুজন খুড়া কোথায় তারে পাইল, ক্যান আনল, কি বিত্তান্ত, কিছুই তো কইল না।'

রঙ্গিলার মা বলে, 'জানবি লো ঠাকুরঝি, ঘরে গিয়া সগল শুনবি। পরবাসী গোরাচাঁদ নদীতে বিসজ্জন দিয়া কেউ যাইব না। এট্টু ধৈয্য ধর।'

'ধৈয্য যে মানে না বউ ! ভাসুর দুইজন না থাকলে দৌড়াইয়া যাইতাম গোরাচাঁদের কাছে। কি রূপ ! পুরুষ মানুষের এমুন রূপ জনমে দেখি নাই লো বউ। এমুন রূপ কি আমাগোর ঢালী-মালীর ঘরে থাকে ! এমুন রূপ থাকে রাজার ঘরে।'

মাঝিঘাটায় এসে একদৃষ্টে অনঙ্গের দিকে চেয়ে থাকে সুবাসী। চোখে পলক পড়ে না।

সুবাসীর গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে রঙ্গিলা বলে, 'সই, গোরাচাঁদের রূপ কেমুন লো?'

মুগ্ধ কিশোরী উত্তর দেয়, 'সোন্দর।'

'পরবাসী গোরাচাঁদ মন মজাইল না কি লো সই!' রঙ্গিলা খিল খিল করে হাসে। তার হাসিতে যত রঙ্গ তত ধার।

সুবাসী লজ্জা পায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামায়। বলে, 'কি যে কইস সই, দিশা পাই না।'

'ঠিকই কই সই, মন তোর মজছে।'

'মন মজে কেমনে?'

রঙ্গিলা হাসে। হাসির দাপটে তার সারা দেহ কাঁপতে থাকে। সে বলে, 'মজে আর কেমনে? আম-কাঠাল (আম-কাঁঠাল) যেমনে মজে।'

'মন যে মজে, বুঝিস কেমনে?'

'আ লো আমার সোনা লো, মন মজন্তির কথা জিগায় (জিজ্ঞেস করে)! ক্যান, তুই বুঝিস না?'

সুবাসী চুপ করে থাকে।

সুবাসীর কানে মুখ রেখে ফিস ফিস গলায় রঙ্গিলা বলে, 'সেইদিন বিলাসীর পিসী একখান বাহারের কথা কইছে। আমি শুনছি। মেয়ে মানুষের শরীলে যৈবন ধরলে নাকি বুকের তলে উথালি পাথালি জাগে। তখন সাধের মানুষ দেখলে মনখান—বুঝলি তো—'

মুখে চোখে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে সুবাসীর দিকে তাকায় রঙ্গিলা। তার মুখখানা বড় গম্ভীর, বড় পাকা পাকা দেখায়। মুখ দেখলে তাকে তের বছরের কিশোরী বলে মনেই হয় না। চোখজোড়া তার চক চক করে।

হঠাৎ রঙ্গিলা ডাকে, 'সই—'

'কী?'

'অলঙ্গরে দেইখা তোর উছল বুকের তলে শিরশিরানি জাগে?'

সুবাসী বলে, 'তোর সরম ভরম নাই।'

'সরমভরম সগল তোর লেইগা আঞ্চলে (আঁচলে) গিরা বাইন্ধা (বেঁধে) রাখছি। সরমের মাথা না খাইলে তোর মনের কথা জানুম কেমনে?'

'আমার মনের কথা নাই।'

বুক থেকে কাপড় খসে পড়েছিল। চকিতে আবার বুক ঢাকে সুবাসী।

রঙ্গিলা বলে, 'আছে লো সই, আছে। কাপড় দিয়া বুক ঢাকন যায়। বুকের কথা কাপড় দিয়া ঢাইকা রাখন দায়। মুখ আর চোখের চিকিমিকিতে সেই কথা ফুইটা বাইর হয়।

বলতে বলতে সুবাসীর একখানা হাত ধরে রঙ্গিলা। বলে, 'ধলেশ্বরী সাক্ষী রাইখা আজ আমরা সই পাতাইছি। ধলেশ্বরী সাক্ষী রাইখা একখান কথা কই। পিরথিমীর কোন মানুষের কানে তোর মনের কথা দিমু না। পরবাসী গোরাচাঁদ তোরে মিলাইয়া দিমু।'

দুই সইয়ের হাত ধরাই থাকে। দুই কিশোরীর পরাণে পরাণে ফাঁস পড়ে।

পশ্চিম আকাশে সূর্যটা আরো ঢলেছে। অনেকদূরে একটা বালুচর কিশোরীর প্রথম বুকের মত ফুটি ফুটি করেও ফোটে না। দিনের শেষ রোদে সোনার রঙ ধরেছে। সেই রোদ নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁপে।

সুজন মাঝি অনঙ্গের হাত ধরে বলে, 'চল গোরাচাঁদ, ঘরে যাই।'

সকলে জিরানিয়া ঘাট পিছে ফেলে, নক্সিকাটা চকের উপর দিয়ে গ্রামের দিকে চলল।

সবার আগে আগে চলেছে সুজন মাঝি আর অনঙ্গ। সবার পিছে পিছে চলেছে সুবাসী আর রঙ্গিলা।

গ্রামের নাম সোনারঙ।

স্বরূপ নগর থেকে সোনারঙ। ধলেশ্বরীর দুই তীরে দুই গ্রাম। ওপার থেকে এপারে এল অনঙ্গ। ধলেশ্বরীই তাকে নিয়ে এল।

ধলেশ্বরী কত সুখ কত প্রণয় গড়ে। কত সুখ কত প্রণয় ভাঙে। দিবানিশি দুর্জ্ঞেয় ভাষায় বুঝি বা এই ভাঙাগড়ার পালা গায়; দুর্বোধ্য অক্ষরে দুই তীরে এই ভাঙাগড়ার গাথাই বুঝি লেখে।

অনঙ্গ এই তীরে পা রাখল।

ধলেশ্বরীর মনে কী আছে, কে জানে।

॥ চার ॥

ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে সুজন মাঝি সেই যে পরবাসী গোরাচাঁদ এনেছিল, তারপর তিনটি বছর ঘুরে গিয়েছে।

ধলেশ্বরী ঠিকই আছে।

মাতানিয়া গাঙে চিরদিনের মতই উজান ছুটেছে। জিরানিয়া নদীতে ভাটির তুফান খেলেছে। কিন্তু তিন বছর আগের কিশোর অনঙ্গ আজ আর কিশোর নেই। গোরা রঙ আরো ফুটেছে। চোখের টান, নাকের ছাঁদ, মুখের ডোল কি সুন্দরই না হয়েছে। ঠোঁটের উপর কালো গোঁফের রেখ্ পড়েছে।

বড় বাহারের রূপ। এমন রূপ বড় ঘরে মেলে না। এমন রূপ রাজা-বাদশার ঘরে দুর্লভ।

বুড়ো সুজন মাঝির ছেলেপুলে নেই। অনঙ্গকে পেয়ে সে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। তার সদাই চিন্তা, কি দিয়ে সে অনঙ্গকে ধরে রাখবে? খাট-পালঙ্ক নেই, সোনাদানা নেই, মণি-মাণিক্য নেই—শুধু কাঁচা বাঁশের বেড়া আর টিনের চালের ছোট্ট ঘরে কি এই রূপ বেঁধে রাখা যায়!

যখন গ্রামে থাকে, তখন দিবানিশি অনঙ্গকে ঘিরে থাকে সুজন মাঝি। যখন সওয়ার নিয়ে দূরদেশে যায়, তখন চোখে ঘুম থাকে না। মনের মধ্যে কত ভাবনা যে ওঠে-পড়ে, তার লেখা-জোখা নেই। চিন্তা হয়, ফিরে হয়ত অনঙ্গকে দেখতে পাবে না। সে হয়ত চলে গিয়েছে। এই তিন বছরে অনঙ্গের উপর বড় মায়া বসে গিয়েছে সুজন মাঝির।

একটা পাখি পুষলে তার উপর মায়া পড়ে, আর এ তো একটা মানুষ। মানুষের জন্য মানুষের মায়া, বড় বিষম মায়া।

অনঙ্গকে নিয়ে সব সময় সুজন মাঝির চিন্তা। সাধে কি আর চিন্তা আসে। তিন বছর আগে ব্রজবাসী যেদিন অনঙ্গকে তার হাতে দিয়েছিল, সেদিন একটা সর্ত ছিল। যেদিন প্রয়োজন হবে, সেদিন ব্রজবাসী অনঙ্গকে নিয়ে চলে যাবে। কবে যে অনঙ্গকে তার প্রয়োজন, কে বলবে।

অনঙ্গকে খুশী রাখার চেষ্টায় ত্রুটি নেই সুজন মাঝির। বিলান দেশ থেকে চন্দনমাটি নিয়ে আসে। হাটেগঞ্জে নৌকা ভিড়িয়ে পিরাণ কেনে, পাকা মিঠাই কেনে, আরো কত কি যে আনে। মন তার বুঝ মানে না।

দূর দূর গঞ্জে সওয়ারী রেখে ঘরে ফিরে যখন দেখে অনঙ্গ ঠিকই আছে, তখন অবুঝ শিশুর মত আহ্লাদে গেয়ে ওঠে সুজন মাঝি—

বড় ভাব লাগালি মনে,
প্রেমে তনু ডগমগ
ধারা বহে দুনয়নে রে।
তোর ভাবনা ভেবে মরি,
ধৈর্য্য হতে নাহি পারি,
আমি কি করিতে কি না করি,
ভাবি নিশি দিনে রে।
ভাবনার হল বিদ্ধি,
কি করিবে মহাষধি,
ভাবনা রোগে নাই রে বিধি,
আয়ুর্ব্বেদ নিদানে রে,
বড়ই ভাব লাগালি মনে এ-এ-এ—

অনঙ্গকে পেয়ে সব কিছু ভুলেছে সুজন মাঝি। কিন্তু সময় তাকে ভোলে নি। তিন বছরে পাকা চুলে আরো পাক ধরেছে। সাদা

মাথা আরো সাদা হয়েছে। বুড়ো সুজন আরো বুড়ো হয়েছে। আঁটো শরীর ঢিলা হয়েছে।

এই তিন বছরে ধলেশ্বরী ছাড়া আর সকলেরই পরিবর্তন হয়েছে।

নদীর জলে জোয়ার ভাটির ঢলক খেলে। জোয়ারের পিছে ভাটি, ভাটির পিছে জোয়ার। ধলেশ্বরীর বুকে দিবানিশি জোয়ার-ভাটির মাতামাতির খেলা।

নদীর নিয়মের সঙ্গে মানুষের নিয়ম মেলে না। নদীতে জোয়ারের পিছে ভাটি, ভাটির পিছে জোয়ারের আশা থাকে। মানুষের জীবন থেকে সাধের জোয়ার একবার গেলে, সেই যে ভাটির টান ধরে, হাজার মাথা কুটলেও আর সেই জোয়ার ফেরে না।

সুবাসী আর রঙ্গিলার কিশোরী দেহে সেই সাধের জোয়ার এসেছে।

তিন বছর আগে দুই সই যেদিন ধলেশ্বরীতে কলার মান্দাসের চৌয়ারি ভাসাতে গিয়েছিল, সেই দিনে আর এই দিনে কত তফাত। সেদিন কিশোরীর চিকণ মাজা থেকে দশ হাতি শাড়ি খসে খসে পড়েছিল। তিন বেড় দিয়েও শাড়ি সামলে রাখা দায় হয়েছিল।

তিন বছরে চিকণ মাজায় ভার নেমেছে। মাজা সুঠাম হয়েছে। সুঠাম কোমরের চারপাশে রেখ্‌কাটা বাহারের শাড়ি আজকাল কি বশেই না থাকে!

শুধু কি মাজাই সুন্দর হয়েছে? বুক! তিন বছর আগের কিশোরীর অস্ফুট বুক এখন উছল হয়েছে। বুকের ভিতর আজকাল অকারণে শিরশিরাণি জাগে।

খালি কি মাজা আর বুক! কালো চোখের তারায় এখন কত ধার, স্বভাবে কত ভার। চলন কত ধীর, বলন কত স্থির।

তিন বছর আগের কিশোরী এখন গরবিনী যুবতী। সাধের জোয়ারে দুই সইয়ের সারা দেহ ছাপাছাপি করে ভরে উঠেছে।

শুধু কি অনঙ্গ, সুজন, সুবাসী, রঙ্গিলারই পরিবর্তন হয়েছে। এই তিন বছরে ধলেশ্বরী পারের কতজনের প্রাণে রসের বান ডেকেছে,

কতজনের প্রাণে রস শুকিয়ে গিয়েছে, কতজনের কাঁচা মনে পাক ধরেছে। কিশোর যেমন যুবা হয়েছে, কতজনের যৌবন তেমন ঢলেছে। কেউ কুলে কালি দিয়েছে, কলঙ্কের ডালা মাথায় নিয়ে কেউ পরবাসে চলে গিয়েছে।

সবারই বদল আছে। কিন্তু নদীর নেই। চিরদিন সে একই থাকে। নির্লিপ্ত দর্শকের মত সব দ্যাখে, নিরাসক্ত শ্রোতার মত সব শোনে।

॥ পাঁচ ॥

মালীপাড়াটা গ্রামের দক্ষিণে।

একালে মালীদের জাতিকুলের কর্ম ছিল নানাবিধ সাজের কাজ। ফুলের সাজ, লতাপাতার সাজ, শোলার সাজ। এদেশে বলে ডাকের সাজ।

ফুলশোলা, লতাপাতা দিয়ে মালীরা মালা-মুকুট বানাতো, অঙ্গদ-কুণ্ডল বানাতো, কেয়ূর-কঙ্কন বানাতো। সেই সব সাজ যোগান দিত ধনপতি সওদাগর কি রাজা-রাজড়াদের ঘরে।

মালীদের জন্য রাজা-রাজড়াদের ঘরে আদর ছিল, খাতির ছিল। রাজা-রাজড়ারা গিয়েছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে মালীদের আদরের কাল, খাতিরের কালও গিয়েছে।

মালীদের কুল উপাধি মালাকার।

মালীপাড়ার সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ কুঞ্জ মালী। বুড়ো কুঞ্জ পুরনো আমলের কথা বলে। এক শ কারিগর নিশিভোর পিদীম জ্বালিয়ে সাজ বানাতো। ফুলে আর শোলায় কত সুন্দর কারিগরি ফুটিয়ে রাজার ঘর থেকে কতখানি খাতির, কতখানি সোনাদানা আনা যায়, এই ছিল সবার ভাবনা। এই নিয়ে যত দ্বন্দ্ব।

মালাকারদের চোখে ঘুম ছিল না। পিদীমে পিদীমে সারা রাত মালীপাড়াটা দিনমান হয়ে থাকত।

একালে মালীপাড়ার সব পিদীম নিবে গিয়েছে,সব জলুষ ঘুচে গিয়েছে।

কুলকর্ম জাতিধর্ম হারিয়ে মালীদের কেউ কেউ এখন মৎস্যজীবী হয়েছে। কেউ কামলা খাটে, কেউ কৃষাণী করে, কেউ মাঝিগিরি ধরেছে। কারো কারো কোন বৃত্তিই নেই। নানান উঞ্ছবৃত্তিতে তাদের দিন কাটে।

মালীপাড়ার শেষ মাথায় চন্দ্র মালীর ঘর।

ধলেশ্বরীর পুব পারে ঝিকিমিকি দিয়ে সূর্য উঠেছে। রাঙা রোদ মাতানিয়া গাঙ পাড়ি দিয়ে এপারে এসে পড়েছে।

দ্রুত তালে ফাল্গুনের দিন বাড়ে। রোদের তাপ বাড়ে, তেজ বাড়ে।

সাত পুরুষের পুরনো ভিটায় নতুন ঘর তুলেছে চন্দ্র মালী। সাতাশের বন্দের ঘর। কঁ্যাচা বাঁশের বেড়া, ঢেউ টিনের চাল।

চন্দ্র মালী মানুষটা বড় শৌখিন। প্রাণভরা তার নানান সখ। টিনের চালের দুই মাথায় পেখম মেলা দুই ময়ুর বসিয়েছে। বড় বাহার খুলেছে।

নতুন ঘরের বারান্দায় বসে তামাক টানছে চন্দ্র মালী। আর দুই চোখ বুঁজে সাধের ঝিমানিতে ঢুলছে।

সুবাসীর মা ফুটি ফুটি ভোরে কলস নিয়ে নদীতে গিয়েছিল। ভিজা কাপড়ে বাড়ি ফিরে দ্যাখে, মানুষটা এখনও তামাক টানছে।

সুবাসীর মা বলে, 'আ গো, কেমুন মানুষ তুমি, এট্টু আক্কল নাই! ভোর থিকা তামুক পোড়াও আর ঝিমাও। কত বেলা হইছে, খেয়াল করছ?'

চন্দ্র মালীর সাধের ঝিমানি ছুটে যায়। ধীরে সুস্থে আয়েসের হাই তোলে সে। হুঁকো-কলকি নামাতে নামাতে বলে, 'কী কইস বউ?'

'হাটে যাইবা না? পিরথিমীর সগল মানুষ কাকপক্ষী জাগনের আগে হাটে গেছে গিয়া। তুমি খালি বইসা বইসা ঢুলাও। খেয়াল নাই, আইজ বিষ্যুৎবার।'

চন্দ্র মালী মিটি মিটি তাকায়। বলে, 'আমি কি বিষ্যুৎবারের গুলাম (গোলাম), আমি তোর গুলাম।'

মানুষটা চিরটা কাল একই আছে। রঙ্গ, রস কোনকালেই তার ফুরায় না। বয়স যত বাড়ে রঙ্গে তত পাক ধরে। বয়সের তাপে প্রাণের রস ঘন হয়। ঘন রসে যত সুবাস তত মৌতাত।

সুবাসীর মায়ের বুকে সুখের শিহর খেলে। মুখেচোখে কিন্তু নকল রাগ ফুটে ওঠে। সে বলে 'বুড়াকালে রঙ্গের কথা শুনলে গা জ্বলে।'

বলতে বলতে কাছে এগিয়ে আসে, 'আ গো, আক্কলের মাথা নি খাইছ! ঘরে বড় মাইয়া আছে না? শুনব না?'

'মেয়ের শোনন-বোঝনের কিছু বাকী আছে? দুই দিন আগেই শুনুক। দুই দিন পর জামাইর ঘরে গিয়া কত শুনব?'

'আ গো তুমি না বাপ! কোন কথাই কি তোমার মুখে বাধে না?'

'মাইয়ারে জিগাইস (জিগ্যেস করিস) বউ, এমুন কথা শুনতে তার কেমুন লাগে?' হাতের তালুতে ভর দিয়ে চন্দ্র মালী উঠে পড়ে।

'মা গো মা, সব্বনাইশার (সর্বনাশার) মুখখান কি!'

চন্দ্র মালী উত্তর ছায় না। খালি হাসে। সুবাসীর মায়ের গা-জ্বালানি পরাণ-মাতানি হাসি।

বারান্দা থেকে উঠানে নামে চন্দ্র মালী। বলে, 'যাই লো বউ। হাট থিকা আনুম কী?'

'কত বছর তো সোংসার পাতছ! সোংসারে কি লাগে কি না লাগে, জান না? মাছ-পান, শাক-মরিচ, গুয়া-খর (খয়ের) সগল আইনো।'

উঠানের এক কোণে একটা বাঁকা মান্দার গাছ। গাছের গায়ে বৈঠা ঠেসান দেওয়া। চন্দ্র মালী বৈঠার দিকে যায়।

সুবাসীর মা ডাকে, 'আ গো, শোন।'

বৈঠা নিয়ে চন্দ্র মালী কাছে আসে, 'কী হইল বউ?'

'আমার কথা মনে নি আছে?'

'কোন কথা?'

'আঃ, আমার কপাল! কেমুন বাপ তুমি। পরাণে এট্টু ভাবনা নাই। মাইয়ার দিকে একবার চাইয়া ছাখ?'

'ক্যান, মাইয়ার হইছে কী ?'

'হইছে আমার কপাল।'

সুবাসীর মা কপাল থাপড়ায় আর বলে, 'চৌখের মাথা নি খাইছ ? ভাদ্দর মাসের নদীর লাখান (মত) মাইয়া ভইরা উঠছে। সুবাসীয় দিকে তাকাইলে বুক আমার কাঁপে। গলা দিয়া ভাতের গরাস কাঁটা হইয়া নামে। সারাটা রাইত চৌখে ঘুম থাকে না।'

চন্দ্র মালীর চিরকালের যা স্বভাব, তাই করে। মিটিমিটি হাসে। বলে, 'তোর বুকের কাঁপন বুঝলাম না কোন দিন। কাঁটা কিনা তুই-ই জানিস, গলা দিয়া ভাতের গরাস নামে ঠিকই। সারা রাইত পইড়া পইড়া ঘুমাস, তাও দেখি। যেই সেই ঘুম, কানের কাছে ঢাক বাজি বাজাইলেও ঘুম ছোটে না।'

'আ গো রঙ্গের মানুষ, সগল কথায় তামাসা কইরো না। মাইয়া বড় হইছে। পাঁচ মুখে পাঁচ কথা উঠছে। মেয়ে আর ঘরে রাখুম না।'

সুবাসীর মায়ের মুখখানা বড় গম্ভীর দেখায়, 'মাইয়া পনেরো গিয়া ষোলতে পড়ছে। আমাগোর কালে এই বয়সে মেয়েমানুষ দুই বিয়ান দিছে।'

চন্দ্র মালী মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দ্যায়। মুখে তার স্বভাবের হাসি লেগেই থাকে।

সুবাসীর মা আবার বলে, 'হাট ভাঙলে ধলেশ্বরীর ঐ পারে যাইও। বাজিতপুরে কয় ঘর মালী নয়া বসত করছে। সেইখানে গিয়া সুবাসীর লেইগা ছেলের খোঁজ নিবা।'

'নিমু।'

'নিবা কিন্তুক, মাথা খাও।'

'কইলাম তো নিমু।'

রোদের তাপ বাড়ে। মাটি তাততে থাকে। মাতানিয়া নদীতে ঢলক খেলে। উজানিয়া বাতাসে পাক খেতে থাকে।

॥ ছয় ॥

ক্যাচা বাঁশের বেড়ার আড়াল থেকে সব কথা শুনেছে সুবাসী। শুনতে শুনতে বুকের ভিতর কাঁপুনি ধরেছে।

বাপ গিয়েছে জিরানিয়া ঘাটে। মা গিয়েছে ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরতে। পিছন দুয়ার খুলে সুবাসী ছুটল ঢালী পাড়ার দিকে।

মালো পাড়ার পর উজানিয়া খাল। খালের উপর সাঁকো। সাঁকো পেরিয়ে তিলের ক্ষেত। তারপর নিকারীপাড়া। নিকারী পাড়ার পর মুলিবাঁশের ঝোপ, বেতবন। তার ওপর ঢালী পাড়া।

উজানিয়া খালের সাঁকোতে এসে উঠল সুবাসী।

উজানিয়া খালে ধলেশ্বরীর উজানভাটি ঢুকে ঢলক খেলে। ঢলকের মুখে ধর্মজাল পেতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল অক্রুর মালো।

সাঁকোর বাঁশে সুবাসীকে দেখে অক্রুর ডাকে, 'সুবাসী নাকি লো?'

অক্রুর মালো সম্পর্কে সুবাসীর জেঠা।

সুবাসী বলে, 'হ, জেঠা—'

'এই দিকে আয়। কয়টা মাগুর মাছ নিয়া যা। তোর মায়েরে দিস।'

'জেঠা গো, ঢালীপাড়ায় যাই। ফেরার পথে নিয়া যামু।'

সাঁকো পার হয়েই তিলের জমি। জমির মাঝখানে সেকেন্দর নিকারীর বিবির সঙ্গে দেখা। বিবির নাম ফুলজান।

ফুলজান বড় শৌখিন বিবি। চোখের কোলে সুর্মার টান মারে চিকন চিকন। হাতের পাতায় রস মাখে মেহেদীর। পায়ে খড়ম ছাঁয় নক্সিকাটা।

ফুলজান বিবি বলে, 'ভোর সকালে অমুন উদ্ধশ্বাসে কই যাস লো সুবাসী ?'

'আ গো ফুফু, পরে কমু।'

ফুলজান বিবিকে পিছনে রেখে নিকারী পাড়ার মধ্য দিয়ে সুবাসী ছুটল। এ ডাকে, সে ডাকে, 'আ লো সুবাসী, শোন দেখি—'

সুবাসী একে বলে, 'অখন না চাচী, আর এক সময় শুনুম।'

সুবাসী ওকে বলে, 'অখন না গো নানী, পরে আসুম।'

সুবাসী ছোটে। মুহূর্তের জন্য দাঁড়ায় না। ছুটতে ছুটতে ভরাট, নিটোল বুক দুটি ওঠানামা করে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ে।

নিকারী পাড়ার পর মূলিবাঁশের ঝোপা, কাঁটাবেতের বন। সে সব পার হয়ে ঢালীপাড়ায় ঢুকল সুবাসী।

মালী পাড়া, নিকারী পাড়া, ঢালী পাড়ার সবাই বিস্ময় মেনে দেখল, মালীর মেয়ে সুবাসী আলুথালু হয়ে ঢালী পাড়ায় গিয়ে ঢুকল।

ঢালীপাড়ার এ মাথায় নয়ন ঢালীর বাস। নয়ন ঢালী রঙ্গিলার বাপ। নয়নের ঘরখানা দো-চালা। সামনের দিকে বারান্দা। বারান্দা-খানা ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

সুবাসী ডাকে, 'সই, সই লো—'

রঙ্গিলা ঘরে নেই। রঙ্গিলার মা বলে, 'সুবাসী না কি লো ? আয় মা আয়। বারিন্দায় চিকনাইখান (এক জাতীয় পাটি) বিছাইয়া বস।'

সুবাসী চিকনাই বিছিয়ে বসে।

রঙ্গিলার মা বলে, 'কি লো মাইয়া, ভোর সক্কালে কি মনে কইরা মাসির বাড়িত আসছিস ?'

'সইয়ের কাছে আসছি।'

উঠানের এক কিনারে বসে নতুন হাঁড়িতে খুদ জ্বাল দিচ্ছে রঙ্গিলার মা। সকাল বেলায় সকলে জাউ খায়। খুদের জাউ খেতে বড় ভাল।

উনুনের মুখে শুকনো মান্দার পাতা গুঁজে দ্যায় রঙ্গিলার মা। শুকনো পাতা দপ্ দপ্ করে জ্বলে।

রঙ্গিলার মা বলে, 'তোর মা কী করে অখন?'

'গাঙ থিকা ছান (স্নান) কইরা জল নিয়া আসল।'

'বাপে কী করে?'

'হাটে গেছে।'

কথা বলে আর পথের দিকে চায় সুবাসী।

রঙ্গিলার মা বলে, 'টালুমালু কইরা পথের দিকে কি দেখিস লো মাইয়া? মাসীর কথায় দেখি মন নাই।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ফাল্গুনের দিন এগুতে থাকে। বেলার দিকে চেয়ে উতলা হয়ে ওঠে সুবাসী। পিছন দুয়ার খুলে আলুথালু হয়ে সে ঢালীপাড়ায় সইয়ের বাড়ি ছুটে এসেছে। কারুকে বলে আসে নি। মা হয়ত মালীপাড়ার ঘরে ঘরে এতক্ষণে তার খোঁজে বেরিয়েছে।

সুবাসী বলে, 'মাসি গো, সই কোনখানে গেছে?'

উনুনের মুখ থেকে জাউয়ের পাতিল নামাতে নামাতে রঙ্গিলার মা বলে, 'আ গো, সইয়ের কথা জিগাইও (জিজ্ঞেস কর) না। রঙ্গিলা কি আমার ঘরে থাকার মাইয়া।'

মুখখানা কালো করে সুবাসী বলে, 'সইয়ের নামে অমন কইরা কইও না মাসী।'

'আ লো, মা লো মা, সইয়ের নিন্দায় মাইয়া দেখি মুখ বেজার করে!' জাউয়ের হাঁড়ি নামিয়ে বিস্ময়ে গালে হাত রাখে রঙ্গিলার মা।

সুবাসী বলে, 'সইয়েরে নিন্দামোন্দ করবা, বেজার হমু না? আমি কি তেমুন সই!'

'মা গো, সাধে কি তোমার সইয়ের নিন্দা করি! তার গুণে

করি। বিহানে (সকালে) উইঠা সেই যে মাইয়া বাইর হইচে ! একদণ্ড যদি পা পাইতা (পেতে) বসে ! থির হইয়া একখান কথা যদি শোনে ; মনেরে না হয় বুঝ দিতাম। কপাল মা, কপাল। অতবড় মাইয়া, ঘরের একখান কাম করে না।'

রঙ্গিলার মা নিজের কপালখানা দেখিয়ে বলে, 'এই দিনও দিন না লো মাইয়া, আরো দিন আছে। পরের ঘরে যাইতে হইব। সেই কথা মনে রাখিস। শ্বউর শাউড়ী চতুদ্দোলায় বসাইয়া খাওয়াইব না।'

'সগল মায়েরই এক কথা। খালি শ্বউর আর শাউড়ী। ঘরের মাইয়া পর কইরা তোমাগোর যত সুখ।'

'আ লো মা, সগল মাইয়ারই দেখি এক কথা। মাইয়া সন্তান হইয়া যখন জনম লইছ, তখন পরের ঘরে যাইতেই হইব। পরের ঘরের লেইগাই মাইয়া মানুষের জনম। বাপ-মা কেউ না সোনা, শ্বউর-শাউড়ীই আপন।'

'জানি মাসি, ঐ কথা হাজার ফির শুনাইয়া হইব কী ?'

'পরের ঘরে গিয়া শ্বউর-শাউড়ীর মন যুগাইয়া না চললে তারা বাপ-মায়ের নিন্দা করব। কইব, বাপ-মা মাইয়ারে খালি আহ্লাদই দিছে। ঢকপদ (সহবত), ঢলন-বলন শিখায় নাই।'

সুবাসী বলে, 'অত কইও না মাসী। পিরথিমীর সগল মাইয়াই শ্বউর-শাউড়ীর মন যুগাইয়া চলে। আমরাও পারুম, দেইখা নিও।'

বলেই জিভে কামড় বসায় সুবাসী। কি বলতে কি যে সে বলল ! বুকের তলায় কাঁপুনি নিয়ে সে ঢালীপাড়ায় এসেছিল। সেই কাঁপুনি হাজার গুণ বাড়ে। কিছুতেই তাকে বাগ মানানো যায় না।

পথের দিকে টালুমালু চায় সুবাসী। পথটা ঢালীপাড়ার মধ্য দিয়ে মাজা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উত্তর দিকের নক্সিকাটা জমিতে গিয়ে নেমেছে। পথের কোথাও রঙ্গিলার চিহ্ন নেই। সুবাসীর উতলা মন আরো উতলা হয়ে ওঠে।

এ দিকে রঙ্গিলার মা হাসে। বলে, 'পাকা মাইয়া, তোর প্যাটে প্যাটে এত! আপন বুঝ অখনই বুঝছিস! বিয়া না হইতেই শ্বউর-শাউড়ীর লেইগা টান। আমরা গব্‌ভে রাখলাম দশ মাস দশ দিন। এত বড়টা করলাম। শ্বউর-শাউড়ী পাইয়া আমাগোর নদীর জলে ভাসাইয়া দিবি নাকি লো মাইয়া?'

রাঙা হাঁড়ি বিড়ার উপর বসিয়ে রঙ্গিলার মা কাছে আসে। সুবাসীর একখানা হাত ধরে বলে, 'সুবাসী লো, তোর সম্বন্ধ আসছে?'

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে সুবাসী। সে বলে, 'জানি না মাসী, আমি কিছু জানি না। তুমি মায়েরে জিগাইও (জিজ্ঞেস করো)।'

সম্বন্ধের কথায় বুকের তলায় সেই থরথরানির বেগটা বেড়েই চলে। চোখ নামিয়ে মাটিতে আঁকিবুকি কাটে সুবাসী।

রঙ্গিলার মা বলে, 'মা-মাসির কাছে লাজ কি লো! সম্বন্ধের কথা ক (বল)!'

'কইলাম তো, আমি জানি না। সই কোনখানে, তাই কও।'

'পাড়ায় পাড়ায় টহল দিতে গেছে। ছাখ্ দেখি মা, কোথায় গেল? দুইটা ঘরের কাম কইরা যে এট্টু আসান দিব, সেই কপাল কি আমার! সেই কপাল তোর মায়ের।'

সুবাসী উঠে পড়ল।

বিনোদ ঢালী, নিবারণ ঢালীর ঘরের চালের তলা দিয়ে সুবাসী ঢালীপাড়ার মাঝখানে গিয়ে উঠল। তার রেখ্‌কাটা শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়তে থাকে।

রঙ্গিলার মা হাসে। তার হাসি বড় মিঠে। মনে মনে সে ভাবে, বিয়ের কথায় সুবাসীর গোরা মুখ রাঙিয়ে উঠেছিল। কুমারী মেয়ের লজ্জামাখা মুখ দেখতে বড় সুখ। নিজেদেরই কুমারীকালের কথা মনে পড়ে যায়।

মিঠে হাসিতে মুখ ভরিয়ে সুবাসীর রেখ্‌কাটা আঁচল যেদিকে উড়ছে, একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল রঙ্গিলার মা।

॥ সাত ॥

মালীদের মতই ঢালীদের দশা।

এককালে মালীদের মতই রাজা-বাদশার দরবারে ঢালীদেরও আদর ছিল, খাতির ছিল। ঢালীরা ছিল সৈন্যসামন্ত, লাঠিয়াল, বরকন্দাজ।

মালীপাড়ার বুড়ো কুঞ্জ মালী যেমন বলে, 'মালীরা কি যেই সেই জাত! কারিগরের জাত, গুণীর জাত।'

তেমনি ঢালী পাড়ার বুড়ো বিনোদ ঢালী বলে, 'ঢালীরা কি যেই সেই জাত। তারা মোগল-পাঠানের লগে লড়াই করছে। তারা বীরের জাত।'

জাতের গরিমা নিয়ে ঢালী-মালীর মৌখিক বিবাদ অনেক কালের।

রাজা-বাদশা নেই, মোগল-পাঠান নেই। মালীদের মত ঢালীদেরও সেই এককাল গিয়েছে।

ঢাল থেকে ঢালী। ঢাল-তলোয়ার হারিয়ে ঢালীদের গৌরব গিয়েছে। একালে তাদের কেউ মাছ মারে, কেউ নৌকা বায়, কেউ কামলা-কৃষাণ খাটে। মালীদের মত ঢালীদেরও নানান উঞ্ছবৃত্তিতে দিন কাটে।

ঢালীপাড়ার ঘরগুলি ছাড়া ছাড়া। সাতাশের বন্দের, পনেরর বন্দের, তেইশের বন্দের, চৌচালা, দোচালা, আটচালা, একচালা—

নানান মাপজোপের ঘর। মাঝখান দিয়ে পথটা এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে।

ঢালীপাড়ার একেবারে শেষ মাথায় উদ্ধব ঢালীর ঘর। সারা পাড়া ঘুরে ঘুরে সেখানে এল সুবাসী। সেইখানেই রঙ্গিলার দেখা মিলল।

উদ্ধব ঢালীর একই মেয়ে। নাম হরিমতী। অগ্রাণ মাসে ধলেশ্বরীর ওপারে তার বিয়ে হয়েছে। হরিমতী সুবাসী-রঙ্গিলার সমান বয়সী।

বিয়ের দু-মাস পর জামাই নিয়ে বাপের বাড়ী এসেছে হরিমতী।

উঠানের এক কিনারে বসে শ্বশুর-শাশুড়ীর কত বাখানই না করে হরিমতী। গলা নামিয়ে সোয়ামীর সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। মানুষটা নাকি বড় বেহায়া, এতটুকু সরমভরম নেই। বলে আর ফিক ফিক হাসে। শুনতে শুনতে দুই কানের লতি গরম হয়ে ওঠে রঙ্গিলার।

অবাক হয়ে রঙ্গিলা শোনে আর ছ্যাখে। হরিমতীর দুই চোখে সুখ আর সোহাগ একই সঙ্গে ঝিকমিক করে। জীবনে একটি পুরুষ পেয়েছে হরিমতী, সেই গরবে সে মাতোয়ারা, সেই আহ্লাদে সে ভরে উঠেছে।

সমুখে বেতের সাজিতে চিঁড়ার মোয়া, নারকেলের সন্দেশ, তিলের নাড়ু সাজানো। হরিমতীকে দেখে, তার কথা শুনে সে সব খাবার সাধ তার নেই। অন্য একটি সাধ রঙ্গিলার বুকের ভিতর মাথা কোটে। শ্বশুর-শাশুড়ীর সাধ। সরমভরম নেই—এমন একটি পুরুষের সাধ।

রঙ্গিলা তাকিয়েই থাকে। চোখের পাতা পড়ে না।

উঠানের আর এক মাথা থেকে সুবাসী ডাকে, 'সই—'

আচমকা চটকা ভাঙে। চনমন করে ঘুরে বসে রঙ্গিলা। বলে, 'আয় সই, এইখানে আয়।'

হরিমতীও ডাকে, 'আয় লো সুবাসী—'

'অখন না হরিমতী, কাইল আস্থম। সারাদিন তোর শ্বউর-শাউড়ীর কথা শুনুম।' রঙ্গিলার দিকে মুখ ফিরিয়ে সুবাসী বলে, 'আয় সই, মাসি তোরে ডাকে।'

রঙ্গিলা উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'যাই লো হরিমতী, সইয়েরে নিয়া কাইল আস্থম।'

খুব উৎসাহ নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ী এবং সোয়ামীর কথা শুরু করেছিল হরিমতী। বাধা পড়ায় সে আদৌ খুশী হয় নি। বেজার মুখে সুবাসী-রঙ্গিলাকে বিদায় দেয়।

দুই সই চলে যায়।

উদ্ধব ঢালীর ঘরে আজ খুব ঘটা। বিয়ের পর এই প্রথম মেয়ে জামাই এসেছে। ঘটার কথাই।

পথে নেমেও রঙ্গিলা-সুবাসী উদ্ধবের বাড়ির চিঁড়া কোটার শব্দ পায়; দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর বানানোর গন্ধ পায়।

রঙ্গিলাকে সঙ্গে নিয়ে জিরানিয়া ঘাটে আসে সুবাসী।

মাতানিয়া গাঙে এখন উজানিয়া টান। তুফান মুখে নিয়ে ধলেশ্বরী তীরে তীরে ঘাড়ি খায়। ঢেউ ফুঁড়ে যে বাতাস ওঠে, জিরানিয়া ঘাটের সারবন্দী হিজলের মাথায় পাক খেয়ে পড়ে।

রঙ্গিলা বলে, 'এইখানে আসলি ক্যান সই?'

সুবাসী বলে, 'সই লো, আমার মরণ—'

রঙ্গিলা পরম সোহাগে সইয়ের একখানা হাত ধরে। বলে, 'অমন কু-কথা মুখে লইতে নাই। তোর মরণ হইব ক্যান? কোন দুঃখু?'

সোহাগের তাপে এবার একেবারে ভেঙে পড়ে সুবাসী। বলে, 'সই লো, সত্যই কই, আমি মরছি।'

সুবাসীকে ঠেলে সরিয়ে দেয় রঙ্গিলা। মুখখানা বেজার করে ধলেশ্বরীর ওপারে চেয়ে থাকে। মন দিয়ে মাতানিয়া গাঙের খলখলানি শোনে।

সুবাসী এগিয়ে আসে। ডাকে, এই—'

রঙ্গিলা উত্তর দেয় না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

দুই হাতে রঙ্গিলার মুখখানা নিজের দিকে ঘুরিয়ে সুবাসী বলে, 'সই লো, গোসা হইস না। মরণের কথা কি সাধে মুখে আসে! বড় দুঃখুতে আসে। কথা শোন ভইন (বোন), রাগ করিস না।'

সুবাসীর গলার স্বর করুণ হয়ে ওঠে।

রঙ্গিলা বলে, 'আবার যদি মরণের কথা ক'বি (বলবি) তো আমার মাথা খাবি।'

'আর কমু না।'

ফাল্গুনের দিন বাড়তে থাকে। রোদের বড় ধার। ধলেশ্বরী তাততে থাকে, মাততে থাকে। জিরানিয়া ঘাটের কিনারে সারি সারি হিজল গাছ। হিজলের ডালে দুটি মাছরাঙা বসে বসে ঝিমায়; মাঝে মাঝে সোজা সরল রেখায় জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

দক্ষিণ দিকে নক্সিকাটা ফসলের মাঠ। কলাই-মটরের সবুজ পাতাগুলি, তিলের হলুদ ফুলগুলি উজ্জ্বল রোদে যেন জ্বলতে থাকে।

রঙ্গিলা বলে, 'কী হইছে ক (বলে)?'

'সই লো, বাপে হাট ফিরতি ধলেশ্বরীর ঐপারে বাজিতপুর যাইব।'

'ক্যান?'

'সেই কথা কইতেই তো ভোরসকালে তোর কাছে উইঠা আসছি। তা তোরে কি সহজে পাই!'

'পাইছিস তো? এইবার ক' (বল)।'

ধলেশ্বরীর ঐ-পার থিকা বাপে তুফান আনতে গেছে। আমার পেরথম যৈবনের পিরীত সেই তুফানে ভাইসা (ভেসে) যাইব।'

সুবাসীর দুই চোখ বেয়ে লোনা, উষ্ণ জল ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে থাকে। রুখা-শুখা (রুক্ষ শুষ্ক) চুল, পরণের শাড়ি আলুথালু। দেখে বড় মায়া হয় রঙ্গিলার।

রঙ্গিলা বলে, 'কিসের তুফান?'

'সই লো, পিরথিমীতে এত জায়গা থাকতে কয় ঘর মালী আইসা বাজিতপুরে বসত করছে। সগলই আমার কপাল। কপালে যে কি আছে!'

'বাজিতপুরে মালীরা নয়া বসত করছে, তোর কপালের লগে তাগো (তাদের) সম্বন্ধ কী?'

'তবে আর কি কই সই? সম্বন্ধ আছে বইলাই (বলেই) কই। বাপে বাজিতপুর যাইব আমার লেইগা পোলা (ছেলে) দেখতে।'

রঙ্গিলা রঙ্গ করে।

ধলেশ্বরী পারের বাসিন্দারা সকলেই রঙ্গ করে। সুখে-দুঃখে রসের কথা বলে। ছড়া কাটে।

রঙ্গিলা ছড়া কাটল।

বইসা কান্দে ফুলের ভমর, উইড়া কান্দে কাগা,
শিশুকালে করলাম পিরীত, যৈবনকালে দাগা,
রে বন্দু, যৈবনকালে দাগা—

রঙ্গিলা বলে, 'ভালই তো হইল। এক পিরীত ভাঙব, আর এক পিরীত গড়ব।'

সুবাসী আকুল হয়ে ওঠে। বলে, 'সই লো, তোর মনে এই আছিল?' বলেই আর সে দাঁড়ায় না। রবি ফসলের মাঠের উপর দিয়ে মালী পাড়ার দিকে ছোটে। রুখা-শুখা চুল বাতাসে ওড়ে, আলুথালু শাড়ি মাটিতে লুটোয়।

রঙ্গিলাও পিছন পিছন ছোটে। পিছন থেকেই সুবাসীর একখানা হাত ধরে ফেলে। বলে, 'সই, পাগল হ'লি? রসের কথা বুঝিস না? আয়, আমার লগে (সঙ্গে) আয়।'

সুবাসীর চোখে জল আসে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ে।

সুবাসীর একখানা হাত ধরে আবার তাকে জিরানিয়া ঘাটে ফিরিয়ে আনে রঙ্গিলা। বলে, 'একদিন এই নদীরে সাক্ষী রাইখা কী কইছিলাম, সগল পিতিজ্ঞা (প্রতিজ্ঞা) আমার মনে আছে।'

সুবাসী বলে, 'আমার কি হইব সই? বাপে যাইব বাজিতপুর। না জানি ভগবান কপালে কি লিখছে!'

রঙ্গিলা বলে, 'মনেরে বুঝ মানা সই। এট্টু ধৈর্য্য ধর। পরবাসী গোরাচাঁদ তোর হাতে দিমুই দিমু।'

'মন যে বুঝ মানে না।'

ধলেশ্বরী উজানে বইছে। একমাল্লাই, দোমাল্লাই নৌকাগুলি ঢেউয়ের মাথায় একবার ওঠে, পরক্ষণেই নামে। মাতানিয়া গাঙে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে জেলেডিঙি ভাসতে থাকে। মিঠেন জলে এখন মাছ মারার ধূম পড়েছে।

দুই সই জিরানিয়া ঘাট পিছনে রেখে গ্রামের দিকে যায়।

সুবাসী আবার বলে, 'সই লো, কি হইব?'

'কি আবার হইব? অলঙ্গরে সগল খুইলা (খুলে) ক'বি (বলবি)। সে বিহিত করব।'

'আমি মাইয়া মানুষ। কেমনে তারে পেরথমে (প্রথমে) মনের কথা কমু? কোনকালে তারে মন দেখাই নাই। আমি মাইয়া, মনখান লুকাইয়া ছাপাইয়া চিরটা কাল চলছি। লাজ সরমের মাথা খাইয়া অখন কেমনে তারে মনের কথা কই?'

সুবাসীর দুই চোখ ছাপাছাপি করে বান ডাকে।

রঙ্গিলা বলে, 'লাজ সরমের মাথা না খাইলে মনের মানুষ পাবি কেমনে?'

'আমি যুবতী মাইয়া, বাপ-মায় তো লাজ-সরমের মাথা খাইতে শিখায় নাই। লাজসরম দিয়া চিরকাল বুকের ভিতর মনখানেরে ঢাকতেই শিখাইছে।'

সুবাসী কাঁপা কাঁপা, অবুঝ, অস্থির গলায় বলতে থাকে, 'অখন কী করি সই?'

রঙ্গিলা বলে, 'আমি তোরে লাজ-সরমের মাথা খাইতে শিখামু।'

॥ আট ॥

বিকালে ঢালীর মেয়ে রঙ্গিলা মালীপাড়ায় আসে। সুবাসীদের উঠানে এসে ডাকে, 'সই—'

সুবাসী বলে, 'আয়, ঘরে আয়।'

'অখন ঘরে যামু না। তুই বাইরে আয়। জল আনতে যাবি না নদীতে?'

'যামু।'

রঙ্গিলার কাঁখে রাঙা মাটির কলসী। সুবাসীও কাঁখে কলসী তোলে।

দুই সই ধলেশ্বরীতে যায়। দুই যুবতীর সুঠাম কোমর মনোহর ছাঁদে ঘুরে ঘুরে চোখকে সুখ দেয়।

জিরানিয়া নদীতে এখন ভাটির টান। জলে মাতামাতি নেই, ঢলে ঢলানি নেই। রোদের তাত জুড়িয়েছে, দিনের তাপ মরেছে।

কাটৌরা আর জলপিপির ঝাঁক বিপুল আকাশ সাঁতার দিয়ে এপার থেকে ওপারে পাড়ি জমায়।

জিরানিয়া ঘাটের দুই দিকে শরঝোপ, বিন্নাবন। উজানিয়া টানে তারা ডুবে যায়, ভাটির টানে মাথা জাগায়।

শরঝোপ বিন্নাবন মাথা জাগিয়েছে। জল অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। নরম কাদায় কাদাখোঁচা পাখিগুলি ঠোঁট খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কি যেন খোঁজে।

জিরানিয়া ঘাট পিছনে ফেলে রঙ্গিলা দক্ষিণদিকে হাঁটতে থাকে।

সুবাসী বলে, 'সই, জল তুলবি না?'

'অখন না। তুই আমার লগে আয়।'

'কই যামু?'

'আয়ই আমার লগে (সঙ্গে)।'

ছুই সই শূন্য কলসী কাঁখে নিয়ে দক্ষিণদিকে যায়। শরঝোপ, বিন্নাবন, আর তিলকলাইর মাঠ পিছনে পড়ে থাকে।

সুবাসী বলে, 'তোর ইচ্ছাটা কি? যাইস কই?'

রঙ্গিলা মিটি মিটি হাসে। বলে, 'যাই তোরে লাজ-সরমের মাথা খাওন (খাওয়া) শিখাইতে।'

জিরানিয়া ঘাটের দক্ষিণদিকে কুমার পাড়া।

কুম্ভকার থেকে কুমার। ধলেশ্বরী পারের বাসিন্দাদের মুখে মুখে কুম্ভকার 'কুমার' রূপ পেয়েছে।

কুমার পাড়ায় সুজন মাঝির বাস। তার ঘরখানা বড় সুন্দর। ছ্যাচা বাঁশের পোক্ত বেড়া, উপরে শনের চাল। চালে বেতের ছিলার বাঁধন। বাঁধনে কত ছাঁদ, কত কারুকাজ। চালটা জলটুঙ্গি ঘরের চালের মত।

সুজন মাঝি জাতে কুমার। কুমারদের মত সে চাক ঘুরায় না। হাঁড়ি-কলসী বানায় না। এমন কি সাজ-প্রতিমার কাজও করে না।

সুজন মাঝি নৌকা বায়।

পরবাসী সওয়ার যদি জিজ্ঞেস করে, 'মাঝি তোমার জাত কী?'

সুজন মাঝি বলে, 'কত্তা আমার জাত নাই। আমি সাধু-গুরু-বৈষ্টমের ছি-চরণের (শ্রীচরণের) ধূলা।'

বলেই হাসে। সুজনের হাসিটি বড় মধুর। হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ছুয়ার কপাট খুলে যায়।

সেই সুজন মাঝি অনঙ্গকে পেয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে।

সুজন মাঝির ছেলেপুলে নেই। সেইজন্য মনে বড় খেদ ছিল। তার মাঝিনীর প্রাণে বড় দুঃখ ছিল। অনঙ্গকে পেয়ে মাঝি-মাঝিনীর সব খেদ, সব দুঃখ ঘুচেছে।

সুজন বলে, 'গৌরাঙ্গসুন্দর আমাগোর (আমাদের) ডাক শুনছে লো মাঝিনী। না হইলে কি এই গোরাচাঁদ মিলত?'

সুজন মাঝির মাঝিনী বলে, 'অলঙ্গরে পাইয়া আমাগোর (আমাদের) সগল দুঃখু ঘুচছে। অন্ধ চৌখে দিষ্টি পাইছি। আমাগোর আন্ধার ঘরে আলো আসছে।'

সুজন মাঝির নিরানন্দ ঘরে সুখের বান ডেকেছে। তার আঁধার ঘর আলোয় ভরে উঠেছে।

কুমারপাড়া থেকে খানিকটা দূরে সুজন মাঝির ঘর। তিন দিকে ফসলের মাঠ। সমুখে ধলেশ্বরী।

উঠানের এক কিনারে পিঁড়ির উপর বসে বাঁ দিকে মাথা হেলিয়ে অনঙ্গ গাইছে। তার গলা বড় মিঠে, বড় সুরেলা।

সুজন মাঝি আত্মহারা হয়ে হাতে হাতে তাল দেয়। তার সরল চোখের তারায় দিব্য আলোর নাচন খেলে। দুই গাল বেয়ে টস টস করে লোনা জল ঝরতে থাকে।

অনঙ্গ গাইছে—

আমি জনম ভরিয়া কাল কাটাইলাম,
কালার আশায় কাল গুণে,
আমার কি জ্বালা হইল রে ভাই,
বাঁশের বাঁশির গান শুনে।

আমি তারে জানিলাম,
তারে আপন মানিলাম,

আমার কইতে যা ছিল সব—

তার হাতে দিলাম।

তারে পেরথম যেদিন দেখেছিলাম,

জনমের এক ফাল্গুনে।

জনম ভরিয়া কাল কাটাইলাম

কালার আশায় কাল গুণে।

এক সময় অনঙ্গের গান থামল।

সুজন মাঝি দুই হাতে অনঙ্গের মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। যেমন করে মানুষ মণিমাণিক্য দেখে, ঠিক তেমন করেই অনঙ্গকে দেখে সুজন মাঝি। দেখে দেখে আশ মেটে না। অতি সুখে সে কাঁদে। চোখের জলে তার বুক ভাসে।

আকুল, গাঢ় গলায় সুজন মাঝি বলে, 'জনম ভইরা (ভরে) তোর আশায় কাল কাটাইছি অলঙ্গ। শ্যাষে তোরে পাইছি। তুই আমার গৌরাঙ্গসুন্দর, মূরলীধারী গোরাচাঁদ। আমারে ছাইড়া (ছেড়ে) যাইস না অলঙ্গ।'

দুয়ার ধরে মাঝিনী দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখেও জল। সে বলে, 'আমাগোর ছাইড়া গেলে কাইন্দা কাইন্দাই (কেঁদে কেঁদেই) মরুম।'

অনঙ্গ উত্তর দেয় না। নিঃশব্দে মাঝি-মাঝিনীর সোহাগটুকু ভোগ করে।

উঠানের পুব কিনারে এক জামির গাছ। তার তলায় দাঁড়িয়ে সুবাসী আর রঙ্গিলা সোহাগের ঘটা দেখছিল। গাছের বাঁকা ছায়া পড়েছে দুই সইয়ের মুখে।

রঙ্গিলা সুবাসীকে ঠেলা দেয়। বলে, 'সই লো, কি দেখিস? মনের মানুষের সোহাগ দেখিস?'

একদৃষ্টে অনঙ্গর দিকে তাকিয়ে ছিল সুবাসী। রঙ্গিলার কথায় সে চোখ নামায়। বলে, 'তোরে লইয়া আমার মরণ! এমুন কথা কইস, ওরা শুনব না?'

রঙ্গিলা হাসে। বলে, ‘শুনুক।’

হঠাৎ সুজন মাঝি জামির গাছের তলায় দুই সইকে দেখে ফেলে। বলে, ‘সুবাসী-রঙ্গিলা না ?’

দুই সই মাথা নাড়ে। মুখে বলে, ‘হ।’

সুজন মাঝি বলে, ‘আয় তোরা, সগলে আয়। আমার গোরাচাঁদ দেইখা যা। নইদার (নদীয়ার) গৌরাঙ্গসুন্দর আমার ঘরে আসছে।’

কলসী কাঁখে দুই যুবতী এগিয়ে আসে। আগে আগে রঙ্গিলা, পিছন পিছন সুবাসী—নত চোখ, আঁটা ঠোঁট। পা দুটো কিসের ভারে যেন বার বার জড়িয়ে যায়।

সুজন মাঝি আবার বলে, ‘ছাখ্, ছাখ্ তোরা। আমার শূন্য ঘর ভইরা (ভরে) উঠছে।’

দুই যুবতীর সামনে এমন সোহাগের ঘটায় অনঙ্গ বড় লজ্জা পায়। দিশাহারা হয়ে সে এদিক সেদিক চায়।

রঙ্গিলা ফিক ফিক হাসে। বলে, ‘দেখি দেখি, পরবাসী গোরাচাঁদেরে। বড় বাহারের গোরাচাঁদ গো জেঠা!’

পিছন থেকে সুবাসী রঙ্গিলাকে ঠেলা দেয়। মৃদু স্বরে বলে, ‘কি লাগালি সই ?’

‘ছাখ্ কেমুন রঙ্গ লাগাই।’

সুবাসী আগের সুরেই বলে, ‘তোর মতিগতির তল পাই না।’

‘পাইয়া কাম নাই।’

রঙ্গিলাকে দেখে অনঙ্গর মনে সুখ নেই।

তিন বছর আগে ঢালীর মেয়ে মালীর মেয়ে যেদিন সই পাতিয়ে মাতানিয়া গাঙে কলার মান্দাসের চৌয়ারি ভাসাতে গিয়েছিল, সেদিন ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে অনঙ্গকে জিরানিয়া ঘাটে এনেছিল সুজন মাঝি। নদীর পারেই দুই সইকে দেখেছিল অনঙ্গ।

সেদিন সুবাসী রঙ্গিলা কিশোরী ছিল। চিকণ মাজায় তিন কেচু

দিয়েও দশহাতি রেখ্‌কাটা শাড়ি বশ মানত না। তিন বছরে দুই কিশোরী ভরে উঠেছে। অপুষ্ট মাজায় ভার নেমে সুঠাম হয়েছে।

অনঙ্গর বিস্ময় ধরে না। তিন বছরে কিশোরী যুবতী হয়ে গেল।

তিন বছরে কিশোরীর মনের কত খেলা দেখল অনঙ্গ, কত কথা শুনল। কিশোরী যখন যুবতী হয়, তখন তার মনের রীতি বোঝা যায় না। অনঙ্গও বোঝে না। দুই সইকেই তার মনে ধরে। দুই কূল ছাপাছাপি করে যখন যুবতীর দেহে ঢল নামে, তখন মনে না ধরেই বা গতি কি?

ঢালীর মেয়ে রঙ্গিলাকে দেখলে সুখ থাকে না। সোয়াস্তি থাকে না। রঙ্গিলার মুখে বড় ধার। তার রঙ্গের কূলকিনারা পায় না অনঙ্গ। রঙ্গের তলায় মনখানা লুকিয়ে ছাপিয়ে রাখে রঙ্গিলা।

মালীর মেয়ে সুবাসীর রীতি অন্য। সুবাসী হাসে না, মাতে না, তার রঙ্গ নেই। তার আছে শুধু লজ্জা। চোখে চোখ পড়লেই কোমলমুখী মালীর মেয়ে চোখ নামায়। দুই গালে লালি ছোপ ধরে। ছুঁতে গেলে গুটিয়ে যায়, এ যেন সেই লাজুক লতা। লজ্জাবতী সুবাসীর প্রাণের ভিতর কোথায় যে বাস ভুর ভুর করে, দিশা পায় না অনঙ্গ।

ঢালীর মেয়ে মালীর মেয়ে নতুন যুবতী হয়েছে। কারো মনই বোঝে না অনঙ্গ। এ বড় বিষম ধন্দ। আবার দুই সইকেই তার মনে ধরে; এ বড় বিষম জ্বালা।

সুজন মাঝি বলে, 'আয় রঙ্গিলা, আয় সুবাসী, বস। দুগা (দুটি) চিড়ামুড়ি খা।' মুখ ঘুরিয়ে ঘরের দিকে তাকায় সুজন মাঝি। ডাকে, 'মাঝিনী লো, সুবাসী রঙ্গিলারে চিড়ামুড়ি দে।'

মাঝিনী ঘরে নেই। তার দেখা মেলে না।

অগত্যা সুজন মাঝিই হাতের তালুতে ভর দিয়ে ওঠে। বলে, 'তোরা বস, আমি চিড়ামুড়ি আনি।'

রঙ্গিলা বলে, 'অখন খামু না জেঠা।'

'খাবি।'

সুজন মাঝি ঘরে ঢোকে।

পশ্চিম দিকে সূর্যটা আরো সরে গিয়েছে। জামির গাছের বাঁকা ছায়া আরো বাঁকা হয়ে পড়েছে। ধলেশ্বরীতে এখন ভাটির টান। তার জলে চলক নেই, শব্দ নেই। নদী এখন নিঃশব্দ, নিরুচ্ছ্বাস।

রঙ্গিলা ডাকে, 'পরবাসী গোরাচাঁদ গো?'

অনঙ্গ বলে, 'কী কও ঢালীর মাইয়া?'

'বড় যে মাঝি-মাঝিনীর সোহাগ খাও—'

অনঙ্গ রঙ্গিলার কথা গায়েও মাখে না। উত্তরও দেয় না।

রঙ্গিলা আবার ডাকে, 'অনঙ্গ—'

'কি কও?'

'মাঝি-মাঝিনীর সোহাগ খাইয়াই দিন যাইব? মাঝি-মাঝিনীর মুখ দেইখাই জনম কাটব?'

রঙ্গিলা হাসে। তার হাসির রীতিই যেন কেমন। সারা দেহ দিয়ে হাসে ঢালীর মেয়ে। উজানের টানে ধলেশ্বরীতে যেমন লহর খেলে, হাসির টানে তেমনই তার সারা দেহে লহর খেলে। মাতানিয়া হাসি। হাসির রকম দেখে অনঙ্গর মুখ শুকিয়ে যায়; হাসি শুনে মনে সুখ থাকে না। কি জানি কি বলবে রঙ্গিলা! তার মুখে কিছুই বাধে না। দিশা না পেয়ে অনঙ্গ ইতি-উতি চায়।

রঙ্গিলা বলে, 'কথা কও না যে গোরাচাঁদ?'

'কি কমু?'

'কি কইবা (বলবে), তা আমারে জিগাও (জিগ্যেস কর)? সারা জনম মাঝি-মাঝিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকলেই চলব? পিরথিমীতে অন্য মানুষ যে তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে, সেই দিশা রাখ?'

'কে আবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে?'

'আ গো পুরুষ, চৌখেও নি দেখতে না পাও। তেমুন চৌখ যদি

না-ই থাকে, তা হইলে পুরুষ জনম লইয়া পিরথিমীতে আসছিলা ক্যান ?'

রঙ্গিলার গলায় এখন রঙ্গ নেই। এখন সে আর মেতে মেতে ঢলে ঢলে হাসে না। বুঝি বা ঠেস দিয়েই সে বলে, 'পরবাসী গোরাচাঁদ গো, মাঝি-মাঝিনীর সোহাগে চৌখ বুঁইজা (বুঁজে) থাইকো না। চৌখ এট্টু খুইলো (খুলো)।'

কথার বাহারে মনে এক বিন্দু সোয়াস্তি নেই অনঙ্গর। চারদিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবে, এই বুঝি মাঝি-মাঝিনী রঙ্গিলার কথা শুনে ফেলল।

রঙ্গিলা আবার ডাকে, 'অনঙ্গ—'

'কী কও ?'

'আমাগোর বাড়িত্ যাও না ক্যান ?'

অনঙ্গ উত্তর দেয় না।

রঙ্গিলা আবার বলে, 'বুঝলাম।'

'কি বুঝলা ?'

'ঢালীপাড়ায় তোমার মন নাই।'

বলেই রঙ্গিলা হাসে। সেই মাতানিয়া হাসি। সারা দেহে তার হাসি উথল-পাথল হয়ে ওঠে। রঙ্গিলা মিটি মিটি চায়। বলে, 'সত্য না গোরাচাঁদ ?'

'কি সত্য ?'

'উই যে কইলাম, ঢালীপাড়ায় তোমার মন নাই।'

হঠাৎ অনঙ্গ বলে, 'মনের কথা জিগাইও (জিগ্যেস কর) না ঢালীর মাইয়া। মন যে আমার কোনখানে, নিজেই কি দিশা পাই ?'

রঙ্গিলা বলে, 'মনের দিশা বুঝি পাও না গোঁরাচাঁদ ?'

'না।'

ঢালীর মেয়ের নতুন যৌবনের কাল। যুবতীর ঠমকের শোভা কত! ভুরু বাঁকিয়ে, চোখের তারায় মনোহর ঠসক ফুটিয়ে সে বলে,

'পুরুষ গো, নিজের মনের দিশা পাও না। আমি কিন্তুক পাই। মনভমর (ভ্রমর) তোমার কোনখানে বান্ধা (বাঁধা), সগল জানি।'

মুখচোরা অনঙ্গর মুখেও কথার খই ফোটায় রঙ্গিলা।

অনঙ্গ বলে, 'কোনখানে বান্ধা আমার মনভমর?'

'মালীপাড়ায় গো গোরাচাঁদ।'

সুবাসীর দিকে ঘুরে রঙ্গিলা বলে, 'সত্য না লো সই?'

সুবাসীর চোখ অনঙ্গর চোখে পড়ে। পলকে দুজনে চোখ নামায়। এক কিনারে বসে রঙ্গিলা সব দেখে।

রঙ্গিলা বলে, 'কি বাহার দেখাইলা গো পুরুষ, কি বাহার দেখালি লো সই! চৌখ আমার ভইরা (ভরে) গেল।'

রঙ্গিলা মেতে মেতে ঢলে ঢলে হাসে। হাসে, ঢলে, মাতে কিন্তু কেন জানি তার বুকের ভিতরটা মোচড় খেতে থাকে। রক্তের মধ্যে কোথায় যেন জ্বালা জ্বালা করে। কেন এমন হয়!

সুজন মাঝি বেতের সাজিতে চিড়ামুড়ি সাজিয়ে এনেছে। সে বলে, 'কি বাহার দেখলি লো রঙ্গিলা? কি দেইখা চৌখ ভরল?'

'বড় সোন্দর বাহার জেঠা, অখন কমু (বলব) না। দিন আসুক, তখন কমু।' বলে আর হাসে রঙ্গিলা। হাসে কিন্তু সেই জ্বালাটা যায় না।

অবুঝ শিশুর মত প্রাণ খুলে হাসে সুজন মাঝি। বলে, 'যখন ক'বি (বলবি) তখন শুনুম, অখন চিড়ামুড়ি খা।'

জামির গাছের ছায়া আরো দীঘল হয়ে পড়েছে। সূর্যটাকে আর দেখাই যায় না। ভাটির টানে ধলেশ্বরী বয়েই চলে।

অনঙ্গ মাটিতে চোখ নামিয়ে বসে আছে। সুবাসী ভাবে, সুজন মাঝির উঠানের মাটি দু-ভাগ হয়ে যদি তাকে কোলে নিত। লজ্জায় কপালে কণায় কণায় ঘাম ফুটেছে। সইটা যেন কি! এতটুকু যদি সরম-ভরম থাকত?

রঙ্গিলা বলে, 'চিড়ামুড়ি অখন খামু (খাব) না জেঠা,

আঞ্চলে (আঁচলে) বাইন্ধা (বেঁধে) নিয়া যাই। বাড়িত্ গিয়া খামু।'

দুই সাজি চিড়ামুড়ি নিজের আঁচলে গিরা বেঁধে রঙ্গিলা ওঠে। দেখাদেখি সুবাসীও ওঠে।

হঠাৎ রঙ্গিলা বলে, 'জেঠা গো, একখান কথা—'

সুজন মাঝি বলে, 'কি কথা?'

'সইয়ের মা অলঙ্গেরে যাইতে কইছে।'

'কে—সুবাসীর মা?'

'হ।'

'নিচ্চয় যাইব অলঙ্গ। আমি তারে পাঠাইয়া দিমু।'

'অখন যাই জেঠা।'

কলসী কাঁখে দুই সই জিরানিয়া ঘাটে যায়।

কুমার পাড়া পার হয়ে ধলেশ্বরীর পারে এসে সুবাসী বলে, 'সই, তোর জ্বালায় আমি গাঙে (নদীতে) ডুইবা মরুম।'

'মর, মরণই তোর কপালে আছে। খালি সরম আর সরম! সরমে ঘামাইলে কোনকালেই অলঙ্গরে পাবি না।'

জিরানিয়া ঘাটে নেমে দুই সই কলসীতে জল ভরে।

সুবাসী বলে, 'মিছা কইলি (বললি) ক্যান?'

'কি মিছা?'

'মা কি তারে যাইতে কইছে?'

সুবাসীর নরম গালে খোঁচা মেরে রঙ্গিলা বলে, 'টেলা (বোকা) মাইয়া, পিরীতের রীত বুঝিস! ঘরে পাইয়া তারে মনের কথা ক'বি (বলবি)।'

'আমার যে বুক কাঁপে?'

'কাঁপুক।'

তিল কলাইর মাঠে এসে রঙ্গিলা চতুর হাসি হাসে। বলে, 'সই, পরবাসী গোরাচাঁদ গানখান বড় সোন্দর গাইছে। গানে তোর মনের কথা আছে।'

'কেমুন ?'

'অই যে—'

আমি জনম ভরিয়া কাল কাটাইলাম
কালার আশায় কাল গুণে—

তুই সারা জনম অলঙ্গর লেইগা (জন্য) কাল কাটাইলি না লো সই ?'

'আ লো ঠমকী, তোর মরণ হয় না ক্যান ?'

'মরুম। তোগো (তোদের) দুই জনের জোড় বাইন্ধা (বেঁধে) সুখের মরণ মরুম।'

আগে আগে যায় রঙ্গিলা। পিছনে পিছনে সুবাসী। কলসীর মুখে জল উছলাতে থাকে।

॥ নয়

হাটের নাম স্বজনগঞ্জের হাট।

হাটের শিয়র দিয়ে ধলেশ্বরী গিয়েছে। নদীর কিনারে দূরদেশী পরবাসী নৌকার ভিড় লেগে আছে।

ধলেশ্বরীর পশ্চিম পারে সব চেয়ে বড় হাট স্বজনগঞ্জের হাট।

দূর দূর চর থেকে মাতানিয়া গাঙের উজান ঠেলে ভিনদেশী মানুষ আসে। মানুষের ভিড়ে হাটের মাটি আর নৌকার ভিড়ে ধলেশ্বরীর জল দেখা যায় না।

সূর্য মাথায় নিয়ে হাটে এসেছে চন্দ্র মালী। আসার পথে সওয়ারী মেলে নি।

চন্দ্র মালী কেরায়া বায়। একমাল্লাই নৌকাখানা হাটের এক কিনারে 'পারা' গেঁথে রেখেছে। ফুরসত মত একটা কাঁচা টাকা ভাঙিয়ে মাছ, পান, সুপারি, মরিচ আর সুবাসীর জন্য গন্ধতেল কিনে নৌকার ডোরার নিচে রেখেছে।

হাটে এসেও সওয়ারী মিলল না।

সমস্ত দিন নৌকার গুরায় বসে বসে চন্দ্র মালী ঝিমাল।

সন্ধ্যার আগে আগে হাট ভাঙল।

নৌকায় নৌকায় আলো জ্বলে। পরবাসী নৌকাগুলো 'পারা' তুলে

দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। জিয়ানিয়া নদীতে নৌকাগুলিকে জোনাকির মত দেখায়।

বসে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত বাজিতপুরের সওয়ারী মিলল। যাত্রী তিন জন।

'পারা' তুলে নৌকা ছাড়ল চন্দ্র মালী।

নদীতে এখন উজানের টান। আকাশে ফুটি ফুটি জ্যোৎস্না। আবছা চাঁদের আলোতে উজানিয়া স্রোত চিক্‌মিক করে।

পূর্ণিমার ভরা কোটালের এখনও দিন তুই বাকী। এরই মধ্যে উজানের টানে সাঁ সাঁ তুফানের শাসানি উঠেছে।

নদীর মাঝখানে এসে চন্দ্র মালী বাদাম টাঙাল। নানা রঙের চিত্রকরা বাহারের বাদাম।

নদীর তুফান মোচড় খেয়ে খেয়ে ভাঙে। তার উপর দিয়ে চন্দ্র মালীর একমাল্লাই নৌকাখানা শাহী মেজাজে চলে। গলুইর মাথায় বসে হালের বৈঠায় পাড় দিয়ে দিয়ে সমানে জল কাটে চন্দ্র মালী। নৌকা আড়াআড়ি ধলেশ্বরীর পুবপারে পাড়ি জমায়।

বাজিতপুরের তিন সওয়ারী পাটাতনের উপর বসে ব্যাপার বাণিজ্যের কথা বলছে। আজকের হাটের লাভ-ক্ষতির হিসাব কষছে। তারা হাটের ব্যাপারী।

চন্দ্র মালী বলে, 'কত্তারা, বাজিতপুবেই থাকেন ?'

তিন সওয়ারী এক সঙ্গে বলে, 'হ। ক্যান মাঝি ?'

'আমার বাড়ি নদীর এই পারে। বাজিতপুরের সগল মানুষই আমার চিনা জানা। আপনেগো (আপনাদের) দেখি নাই. তাই জিগাইলাম (জিগ্যেস করলাম)। গোসা নি হইলেন ?'

'না গো মাঝি, গোসা হমু ক্যান ? আমাগোর (আমাদের) বাড়ি আছিল (ছিল) ভাটির হ্যাশে, ম্যাঘনা নদীর দক্ষিণ পারে। রাক্ষসী ম্যাঘ্‌না আমাগোর ভিটামাটি খাইছে। অখন আসছি ধলেশ্বরীর পারে। বাজিতপুরে নয়া বসত করছি। কি জানি, ধলেশ্বরীর মনে কি আছে ?'

চন্দ্র মালী বলে, 'আমাগোব ধলেশ্বরী বড় বাহারের নদী ; তার মিঠান জলে ম্যাঘ্‌না নদীর লাখান (মত) জিভ লকলক করে না। ধলেশ্বরী পুরান বসত খায় না, কিন্তুক নয়া বসত দেয়। ধলেশ্বরীর নামে নিন্দামোন্দ করবেন না।'

ধলেশ্বরীর নিন্দা দুই পারের বাসিন্দাদের প্রাণে বড় বাজে।

বাজিতপুরের সওয়ারীরা বলে, 'কিছু মনে কইরো না গো মাঝি। ঘরবসত গেছে। বড় দুঃখুতে অমন কথা কইলাম।'

চন্দ্র মালী উত্তর দেয় না।

নৌকা তরতরিয়ে চলে।

ফুটি ফুটি চাঁদের আলো আরো ফুটেছে। আকাশে মিটি মিটি তারা দেখা দিয়েছে। নদীব আরশিতে তারাগুলি দোল খায়।

চন্দ্র মালী বলে, 'কত্তারা, বাজিতপুরেব এট্টা খোঁজ যদি দ্যান—'

তিন সওয়ারী বলে, 'কিসের খোঁজ ?'

'শুনছি, বাজিতপুরে কয় ঘর মালী নয়া বসত করছে।'

'ঠিকই শুনছ মাঝি।'

'তাগো (তাদের) নিশানাটা যদি এট্টু দ্যান কত্তা—'

'মালী পাড়ার মধ্য দিয়াই আমাগো পথ। আমাগো লগে যাইও, দেখাইয়া দিমু।'

ধলেশ্বরীর ওপারে নৌকা ভিড়ল। চন্দ্র মালী 'পারা' গাঁথল। কেরায়ার পয়সা হিসাব করে গুণে কোমরের গেঁজেতে পুরল।

বাজিতপুরের তিন সওয়ারী পারে নেমে হাঁটতে শুরু করল। চন্দ্র মালী তাদের পিছন পিছন গেল।

ধলেশ্বরীর এপারে বালুচর। ফুটি ফুটি জ্যোৎস্নায় বালির দানাগুলি চিকচিক করে। রাতকানা কাটৌরা পাখিরা বালুচরের এ মাথা থেকে ও মাথায় ছুটাছুটি করে। বুঝি বা নির্জন, নিঃশব্দ নদীর পারে তাদের নিশিতে পেয়েছে।

বালুচর পার হয়ে বাজিতপুর গ্রাম।

গ্রামের দক্ষিণ মাথায় নতুন বসত গড়ে উঠেছে।

মালী পাড়ায় গান-বাজনার আসর বসেছে।

তিন সওয়ারী আর চন্দ্র মালী মালী পাড়ার কাছে এসে শুনতে পায়, সারিন্দা বাজিয়ে মিঠা গলায় কে যেন ভাটিয়ালী গীত ধরেছে।

পরবাসী নাইয়ারে,
কোন বা দ্যাশে যাও,
যাওয়ার আগে এই কথাখান লও,
এই তো নদীর উজান বাঁকে সোনার বালুচর,
সেইখানেতে আছে আমার পরাণ বন্দুর ঘর।
কইও কথা বন্দুর কাছে,
জল ছাড়া মীন কয়দিন বাঁচে,
বাঁচে রে-এ-এ-এ-এ
ও পরবাসী নাইয়া রে-এ-এ-এ

ভরা আসরের মাঝখানে বাজিতপুরের তিন সওয়ারীর পিছন পিছন চন্দ্র মালী ঢুকল।

তিন সওয়ারীর একজন ডাকে, 'লখাইচাঁদ মালী কোথায় গো?'

আসরের মধ্য থেকে একজন খাটো মানুষ উঠে আসে। তার পিঙলা চুলে বাহারের জটা; মুখ ভর্তি দাড়ির ঘটা। গলায় নয় লহর রুদ্রাক্ষের মালা। মাজা থেকে জানু পর্যন্ত পরণের কাপড়খানা ঝুলছে। কপালে কত যে দাগ তার লেখাজোখা নেই।

দুই হাত জোড়া করে লখাইচাঁদ মালী বলে, 'নাথ মশায়, এই বুঝি হাট থিকা ফিরলেন?'

'হু, তোমরা আসছ কখন?'

'সন্ধ্যার মুখে মুখে ফিরছি। ফিরাই গীতবাদ্যির আসর বসাইছি।' লখাইচাঁদ বলতে থাকে, 'হাটের কথা ক'ন। আইজ বিকিকিনি হইল কেমুন?'

সওয়ারী তিনজন কাপড়ের ব্যাপারী। জাতে তাঁতী; ধলেশ্বরী পারের বাসিন্দারা তাদের বলে, যুগী।

লখাইচাঁদ আবার বলে, 'হাটে কাপড় কেমুন বিকাইল নাথ মশায় ?'

'বিকিকিনির কথা পরে শুইনো (শুনো) মালীর পুত।'

এইবার লখাইচাঁদের চোখ পড়ল চন্দ্র মালীর উপর। তুই হাত জোড়া রেখেই সে বলে, 'নাথ মশায়, এনারে (এঁকে) তো চিনলাম না ?'

'এনায় (এ) হইল কেরায়া মাঝি, ধলেশ্বরীর ঐ পারের মানুষ। তোমাগো (তোমাদের) কাছে আসছে।'

'আসেন গো, আসেন—'

চন্দ্র মালীর তুই হাত ধরে লখাইচাঁদ তাকে আসরে নিয়ে বসায়।

বাজিতপুরের সওয়ারী তিনজন বলে, 'যাই গো লখাইচাঁদ, যাই গো মাঝি—'

মালী পাড়ার পর যুগীপাড়া। কাপড়ের ব্যাপারীরা যুগী পাড়ার পথ ধরে।

লখাইচাঁদ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ডাকে, 'বেঙ্গার মা লো, পান তামুক দিয়া যা, অতিথ আসছে।'

বেঙ্গা লখাইচাঁদের ছেলে।

বেঙ্গার মায়ের নাম রাধা। রাধা লক্ষ্মীব্রতে বসেছে। অনেক ডাকাডাকি করেও তার দেখা মিলল না।

অগত্যা লখাইচাঁদই খুঁজে পেতে তামাকের ডিবে, আগুনের মালসা আর পানসুপারী নিয়ে আসে। নিজেই পান সাজে, কলকির মাথায় তামাক ভরে। চন্দ্র মালীর দিকে পান-তামাক এগিয়ে দিয়ে বলে, 'দয়া কইরা ধরেন গো মাঝি—'

চন্দ্র মালী হুঁকো আর পান ধরে।

মালী পাড়ার জোয়ান ছেলেরা এখনও আসরে বসে রয়েছে। গান বাজনার ভরা আসরখানা ভেঙে যাওয়াতে তারা খুশী হয় নি।

লখাইচাঁদ বলে, 'মাঝির বাস কোনখানে ?'

'ধলেশ্বরীর উই পার, সোনারঙ গেরাম—'

'সোনারঙ গেরামের নাম শুনছি গো মাঝি। মন টানছে, একদিন যামু সেইখানে।'

হুঁকোর মাথা থেকে কলকিটা দুই হাতের মুঠোয় ফেলে চন্দ্র মালী জুত করে টানছিল। বাহারের তামাক। যেমন গন্ধ ভুর ভুর করে তেমনি নেশা ধরায়। মুখ থেকে কলকিটা আলগা করে চন্দ্র মালী বলে, 'যাইবেন গো মালীর পো, একশত বার যাইবেন। নদীর পারে নাইমা (নেমে) একবার খালি কইবেন, চন্দর মালীর বাড়িত্ যামু। সগলে দেখাইয়া দিব।'

দুই চোখে বিস্ময় আর ধরে না লখাইচাঁদের। একটু দূরে বসে ছিল সে। চোখের পাতা পড়ার আগে উঠে পড়ল। সাত লহর রুদ্রাক্ষের মালা বাজাতে বাজাতে চন্দ্র মালীর দু-খানা হাত ধরল। বলল, 'মাঝি বুঝি মালীর পুত! আমাগোর স্বজাত!'

'হু।'

মালী পাড়ার জোয়ান ছেলেরা আসর ভাঙার ক্ষোভে বেজার মুখে বসেছিল। এইবার তারাও চন্দ্র মালীর কাছে ঘন হয়ে আসে। সকলের চোখেমুখে ধলেশ্বরীর ঐ পারের মানুষটা সম্বন্ধে কৌতূহল ফোটে।

নানান জনে নানান কথা বলে। চন্দ্র মালী শোনে। কথায় কথায় সেও জেনে নেয়, বাজিতপুরের এই মালীদের বাস ছিল মেঘনার পারে। মেঘনা তাদের ঘর-বসত সব খেয়েছে। অগত্যা সেখান থেকে চলে আসা ছাড়া গতি কি! মাস কতক হল, তারা ধলেশ্বরীর এই পারে এসে নতুন বসত গড়ে তুলেছে।

নদীর ওপার থেকে স্বজাতের একজন মানুষ এসেছে। খবরটা নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে। মালী পাড়ার বুড়ো মানুষগুলি চন্দ্র মালীকে দেখবার জন্য আসে।

একজন বুড়ো মালী বলে, 'মালীর পুত, আপনা থিকা আসলা, বড় ভাল করলা। নয়া আইসা আমরা বসত গড়ছি। এই ছ্যাশের কারো লগে চেনাজানা নাই। স্বজাতের মানুষ দেখলে বুকে বল পাই। ফুরসুত পাইলেই আইসো গো মালীর পুত। ম্যাঘনার মুখ থিকা ধলেশ্বরীর মুখে আসছি। কপালে যে কি আছে!'

চন্দ্র মালী বলে, 'ধলেশ্বরীর উপুর অবিশ্বাস রাখবেন না গো বুড়া মালী। আমাগোর এই নদী হইল মায়ের লাখান (মত)। মা কি সন্তানরে কোল থিকা ফেলাইয়া ছ্যায়! আমার একখান কথা ধরেন। আপনেগো (আপনাদের) নয়া বসত পাকা হইব—দেখবেন।'

'মাঝে মধ্যে তোমরা যদি আস, বল-ভরসা পাই।'

'আসুম নিচ্চয়, আপনেরাও যাইবেন। কিন্তুক আমরা বল-ভরসা দেওনের (দেবার) কে? গোরাচাঁদই বল-ভরসা।'

চন্দ্র মালী দুই হাত জোড়া করে কপালে ঠেকায়। দেখাদেখি বাজিতপুরের মালীরাও দুই হাত কপালে তোলে।

মালীপাড়ার জোয়ান আর বুড়োরা গোরাচাঁদের নামে খুশী হয়। বুড়ো মালীর গলা থেকে আনন্দ উছলে পড়ে, 'মালীর পুত যেন গোরাচাঁদের নাম লইলা!'

'হ।'

'মালীর পুত কি কিষ্ণমন্ত্রী?'

'হ। আমাগোর গেরামের সগল মালীই কিষ্ণমন্ত্রী।'

'বড় বাহারের হইছে। আমরাও সগলে কিষ্ণমন্ত্রী।'

লখাইচাঁদের বউ বসন্ত-লক্ষ্মীর ব্রত করেছিল। ভরা আসরে এসে সকলের হাতে সে প্রসাদ বিলায়। দীঘল ঘোমটার তলায় তার মুখখানা দেখা যায় না।

নদীর ওপারের চন্দ্র মালীকে পেয়ে লখাইচাঁদের উৎসাহ আর ধরে না। সাত লহর রুদ্রাক্ষের মালা বাজাতে বাজাতে সে বলে, 'মালীর পো, আপনেরা আছেন নদীর উই পার, আমরা রইছি এই পার।

আমরা যেমুন কিষ্ণমন্ত্রী তেমুন আবার গুরুমন্ত্রী। দুই পারের মালীরা গুরুর নামে মচ্ছব (মহোৎসব) দিলে কেমুন হয় ?'

লখাইচাঁদের কথাখানা সবারই মনে ধরে। প্রসাদ খেতে খেতে সকলেই সায় দেয়।

বুড়ো মালী বলে, 'একখান ভাল কথা কইছিস রে লখাই। মচ্ছবের আসরে দুই পারের মালীরা মিলতি হমু। বড় সুখের কথা।'

সকলের সায়ে মহোৎসবের কথা পাকা হয়ে যায়।

বুড়ো মালী আবার বলে, 'বুঝলা মালীর পুত, গেরামে গিয়া সগল মালীরে মচ্ছবের কথা কইবা।'

ক্যাঁচা বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে, কপাটের আড়াল থেকে মালী-পাড়ার বউ-ঝি-যুবতীরা ধলেশ্বরীর ঐ পারের নতুন মানুষটাকে দেখে। তাদের মুখচোখ থেকে কৌতূহল উপচে পড়ে।

ভরা আসরের চারদিক নিরীখ করে চন্দ্র মালী বলে, 'বুড়া মালীর পুত মনে একখান বাসনা আছে। দোষ যদি না ধরেন তো বাসনার কথাখান কই।'

বুড়ো মালী বলে, 'কি যে কও, দোষ ধরুম! একখান ক্যান, এক শ খান কথা কও। নদীর উই পারে তোমাগো বসত, এই পারে আমাগো বসত। ধরতে গেলে তোমরা আমাগো আত্মবান্ধব। ধরতে গেলে ক্যান, সত্যই আত্মবান্ধব। মালী কি মালীর পর? রক্তে রক্তে আমাগো সম্পক্ক বান্ধা (বাঁধা)। সাতপুরুষের খোঁজ নিলে দেখবা, তোমাগো লগে আমাগো কুটুম্বিতা বাইর হইব। যাউক উই সগল। অখন যা কইবা, কও গো মালীর পুত।'

চন্দ্র মালী বলে, 'সাতপুরুষের খোঁজ নিতে হইব ক্যান? চোখের উপুর থাকে, এমন একখান কুটুম্বিতা পাতাইতে আসছি গো বুড়া মালীর পুত। লতায়-পাতায় সম্পক্ক না। আমে-দুধে মিশ খায়, এমুন সম্পক্ক চাই।'

লখাইচাঁদ এবং মালীপাড়ার জোয়ান ছেলেরা আগ্রহে চন্দ্র মালীর

গা ঘেঁষে বসে। বুড়ো মালী বলে, 'কেমুন কথাখান কইলা গো মালীর পুত! বুঝি, আবার যে বুঝিও না। খুয়া খুয়া (অস্পষ্ট) লাগে।'

চন্দ্র মালী বলে, 'ঘরে আমার মাইয়া আছে। বিয়ার যুগ্যি হইছে। তের বছর পার হইয়া চৌদ্দে পা রাখছে।'

সুবাসীর বয়স ষোল। ইচ্ছা করেই আসল বয়সটা গোপন রাখে চন্দ্র মালী। মালীর সমাজে ষোল বছরের মেয়ে ঘরে রাখা বড় দায়, বিষম জ্বালা। নানান মুখে নানান নিন্দা-মন্দ রটে।

চন্দ্র মালী আবার বলে, 'বুঝলেন নি, মাইয়া বড় হইছে। সারা রাইত চৌখে ঘুম নাই। ভাতের গরাস গলায় কাঁটা হইয়া বেক্কে

হাটে আসার আগে সুবাসীর মা যে কথাগুলো বলেছিল, ঠিক ঠিক সেই কথাগুলিই বলে ফেলে চন্দ্র মালী। এতটুকু ভুলচুক হয় না।

বুড়ো মালী মাথা নাড়ে। বলে, 'মাইয়া বড় হইলে বাপ-মায়ের চৌখে ঘুম থাকে নাকি? মাইয়া জামাইর ঘরে না যাওন তরি (পর্যন্ত) সুখ নাই, সোয়াস্তি নাই। সত্য কইছ মালীর পুত, গলায় ভাতের গরাস কাঁটা হইয়া বেন্ধে (বেঁধে)।'

'সুজনগঞ্জের হাটে সেইদিন শুনলাম, কয় ঘর মালী বাজিতপুরে নয়া বসত পাতছে। শুইনা (শুনে) আইজ আশায় আশায় আসছি; মাইয়ার সম্ভন্ধ যদি করতে পারি।'

'ভাল ভাল, বড় ভাল সম্বাদ (সংবাদ) কও মালীর পুত। সগলই গোরাচাঁদের ইচ্ছা।' বুড়ো মালী বলতে থাকে, 'নাতির বিয়া দিমু। মাইয়ার খোঁজে আছিলাম (ছিলাম)। গোরাচাঁদই বুঝি নাতির বৌ মিলাইল। ডর নাই গো মালীর পুত। ঘরে যেমন তোমার মাইয়া আছে, আমাগো ঘরেও পোলা (ছেলে) আছে। কপালে জামাই নিয়াই সগল মাইয়া পিরথিমীতে আসে।'

দুই হাত জোড়া করে চন্দ্র মালী বলে, 'তেমুন কপাল কি আমার?'

'কেমুন কপাল ?'

'আপনের নাতির লগে আমার মাইয়ার সম্ভন্ধের কপাল।'

'কি যে কও মালীর পুত।'

বলতে বলতে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বুড়ো মালী ডাকে, 'মুকুন্দ, মুকুন্দ রে—'

ভরা আসরের এক কোণ থেকে একটি ছেলে উঠে আসে।

বুড়ো মালী সস্নেহে ডাকে, 'আয় রে ভাই, বস—'

ছেলেটি বুড়ো মালীর গা ঘেঁষে বসে।

বুড়ো মালী বলে, 'ছাখ গো মালীর পুত, আমার নাতিরে ছাখ। এমুন জামাই তোমার মাইয়ার মনে ধরব তো ?'

ধলেশ্বরীর ওপার থেকে একজন নতুন মানুষ বিয়ের সম্বন্ধ পাতাতে এসেছে। মালীপাড়ার বউ-ঝি-যুবতীদের কৌতূহল আর বশ মানে না। বেড়ার আড়াল থেকে, কপাটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসে তারা ভরা আসবেব সামনে ভিড় জমায়। মুখে কাপড় গুঁজে কেউ ফিক ফিক হাসে। কেউ ফিস ফিস কথা বলে। মুকুন্দর মায়ের মাথা থেকে ঘোমটা খসেছে। নিবীখ করে করে সে নতুন কুটুমের মুখ ছাখে।

মুকুন্দর মুখের দিকে আব চাওয়া যায় না। চোখ নামিয়ে সে বসে আছে। এতগুলি মানুষের সামনে লজ্জায় তার ঘাম ছুটেছে।

চন্দ্র মালী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। চোখেব পাতা পড়ে না। বুকের ভিতর সুখের কাঁপুনি ধরেছে।

মুকুন্দর গায়েব বঙ চাপা। রঙে কি যায় আসে! জামাইর রঙ ধুয়ে মেয়ে কি জল খাবে! পুরুষ মানুষ আবাব কালো! সোনার আংটি আবার বাঁকা। মুকুন্দর চোখমুখ বড় বাহারের। ভাসা ভাসা চোখ, পাথর-কাটা নিখুঁত চেহারা। মুখে দাড়ি গোফের অল্প অল্প রেখা পড়েছে।

মাঝে মাঝে মুখ তুলে চায় মুকুন্দ। চন্দ্র মালীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটো নামিয়ে নেয় সে।

মুকুন্দর বয়স বড় কম। কমই তো ভাল। মেয়েদের কচি জামাই-ই তো মনে ধরে। চন্দ্র মালীর মন বলে, এই জামাইর হাতে পড়লে সুবাসী সুখে থাকবে। সুবাসীর পাশে মুকুন্দকে মানাবে বড় ভাল।

বুড়ো মালী বলে, 'জামাই কেমুন দেখলা?'

'সোন্দর। মাইয়ার আমার কপাল ভাল।' চন্দ্র মালী বলতে থাকে 'পোলা (ছেলে) দেখলাম; এইবার আপনেরা মাইয়া দেখতে আসেন। নিজের মাইয়া। তার রূপগুণের বাখান বাপ হইয়া কেমনে করি? তবে একখান কথা কই। মাইয়া আপনেগো মনে ধরব গো বুড়া মালীর পুত।'

বুড়ো মালী হাসে। ইসারায় মুকুন্দকে দেখিয়ে বলে, 'আমাগো মনে ধরলে কি হইব, মাইয়া তো আর আমার হাতে দিবা না। দ্যাখ, কালাচাঁদের নি মনে ধরে!'

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ে মুকুন্দ। বলে, 'আর ঠিসারা কইরো না বুড়া।' বলেই ছুটে পালায়।

বুড়ো মালী হাসে। ভরা আসরের জোয়ান ছেলেরা হাসে মালীপাড়ার বউ-ঝি-যুবতীরা হাসে। হাসির শোব ওঠে।

বুড়ো মালী বলে, 'এই এক বিয্যুদবার; আর এক বিয্যুদবার তোমাগো গেরামে যামু গো মালীর পুত। সুজনগঞ্জের হাট ফেরত যামু। নাতির বউ দেইখা আসুম।'

নতুন কুটুম হতে চলেছে, তাকে না খাইয়ে ছাড়া যায় না। বুড়ো মালীর ঘরে চন্দ্র মালীর পাত পড়ে। মালীদের এক ঘরের কুটুম হল সকল ঘরেরই কুটুম। মালীপাড়ার এর ঘর থেকে ডাল আসে, ওর ঘর থেকে মাছ আসে, লখাইচাঁদের ঘর থেকে মিষ্টান্ন আসে।

খাওয়া দাওয়ার পর চন্দ্র মালী পান চিবায়। ভুক ভুক করে তামাক টানে। আরামে আর নেশার ভারে আপনা থেকেই চোখ ঢুলে আসে।

বুড়ো মালী বলে, 'রাইতখান থাইকা (থেকে) গেলে হইত না মালীর পুত?'

দুই চোখ থেকে ঢুলুনি ছুটে যায়। চন্দ্র মালী বলে, 'না, আইজ থাকার উপায় নাই। বাড়িতে ভাবব। কুটুম্বিতা হউক; এক রাইত ক্যান, কত রাইত কাটাইয়া যামু।'

নিশুতি রাতে ধলেশ্বরীর কিনার থেকে নৌকার 'পারা' তোলে চন্দ্র মালী। বাদাম খাটায়। পশ্চিমা বাতাসের টানে নৌকা তরতব করে ছোটে।

পিছনে বালুচর, আকাশে ফুটি ফুটি জ্যোৎস্না আর সামনে ভাটির নদী।

গলুইর উপর বসে হালের বৈঠা ধবে থাকে চন্দ্র মালী। বুকের ভিতর সুখের ঢেউ খেলে।

॥ দশ ॥

উজানিয়া খালের কিনার ঘেঁষে সুন্দর মালীর বাস।

উজানিয়া খালের বুক ছাপাছাপি করে ভরা বর্ষায় কত স্রোত বয়ে যায়। বুক খালি করে প্রখর খরায় কত স্রোত শুকায়। উজানিয়া খাল তার হিসাব রাখে না। দুই পারের বাসিন্দারাও এই ব্যাপারে পরম উদাসীন।

ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, সময় বদলায়। সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে উজানিয়া খালও বদলায়। কিন্তু যে নদী থেকে বেরিয়ে এসে উজানিয়া খাল সোনারঙ গ্রামখানাকে পাকে পাকে বেঁধেই চলেছে, সেই ধলেশ্বরীর বদল নেই।

উজানিয়া খালের পারে বাস হয়েও সুন্দর মালীর স্বভাবখানা ধলেশ্বরীর মত। তার স্বভাব কোনদিন, কোনকালে বদলায় না। ধলেশ্বরীর মতই চিরকাল এক থাকে।

সুন্দর মালীর বাপের নাম মোহন মালী। মোহন মালী ছিল গুণী মানুষ, কারিগর। এমন শোলার কাজের কাজী, ফুলের সাজের সাজী মালীপাড়ায় আর একজনও ছিল না।

মোহন মালীর সময়েও বড় মানুষের ঘরে শখ ছিল; সাজের কাজের আদর ছিল।

ভরা বর্ষায় শোলার কাজ, ডাকের সাজ পিনিস নৌকায় ভরে চরদিঘরিয়া পাড়ি দিত মোহন মালী। চরদিঘরিয়া থেকে স্বরূপ নগর,

সাভার, মীরপুর, নন্দনপুর—নানান বাজার-বন্দর ঘুরে মোহন মালীর পিনিস ধলেশ্বরীর বুক থেকে পদ্মা মেঘনার দেশে চলে যেত। ভাটির দেশে, বিলান দেশে এবং দূর দূর নদীর দেশে পরবাস কাটিয়ে খা খা খরায় মোহন মালী ধলেশ্বরীতে ফিরত।

মোহন মালীর ঘরে খাট-পালঙ্ক না থাক, মণি-মাণিক্য না থাক, সোনাদানা ছিল।

মোহন মালী মানুষটা ছিল বড়ই শৌখিন। উজানিয়া খালের পারে মালীপাড়ার শেষ মাথায় দু-খানা জলটুঙ্গি ছাঁদের ঘর তুলেছিল। মাপ ছিল সাতাশের বন্দ; আট চালের ঘর। মালীপাড়ায়, শুধু মালীপাড়ায় কেন, পুরো সোনারঙ গ্রামে এমন বাহারের ঘর কারো ছিল না।

মালীরা বলত, ঢালীরা বলত, নিকারী-মৃধারা বলত, সোনারঙ গ্রামের সবাই বলত, 'মানুষখানের পরাণভরা খালি শখ আর শখ। শখ না থাকলে এমুন বাহারের ঘর তোলা যায়। দেইখা দেইখা আশ মিটে না, চোখ ফিরে না।'

বছর বিশেক আগে মাতানিয়া গাঙ জিলানিয়া নদীর কি খেয়াল হয়েছিল! খা খা খরার দিনে হঠাৎ মেতে উঠেছিল।

ধলেশ্বরী উথলপাথল হয়েছিল। বিরাট বিরাট তুফান উঠেছিল। তুফানগুলি দুই পারে সাঁ সাঁ গর্জনে ঝাপিয়ে পড়েছিল।

সেবার ধলেশ্বরীর তুফানে কত নৌকা যে ডুবেছিল, লেখাজোখা নেই। সেই একবারই মাতানিয়া গাঙ ক্ষেপে উঠেছিল। তার আগে কি পরে কোনকালে ধলেশ্বরী ক্ষেপেছিল কি না, পুরনো আমলের মানুষেরা বলতে পারে না।

ধলেশ্বরীপারের বাসিন্দারা সেই বছরটাকে বলে, বড় তুফানের বছর। বড় তুফানের বছর দিয়ে মানুষের বয়সের, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের হিসাব রাখে তারা।

বড় তুফানে মোহন মালীর পিনিস ডুবেছিল। পরবাস থেকে

ফিরে ধলেশ্বরীতে এসে বিপত্তি ঘটেছিল। তুফানে তুফানে মোহন মালী কোথায় যে ভেসে গিয়েছিল, হদিস মেলে নি। তার পিনিস নৌকার চিহ্ন ধলেশ্বরীর কোথাও ছিল না। দুই পারের বাসিন্দারা বলে, মোহন মালী আর তার পিনিস নাকি বড় নদীতে ভেসে গিয়েছে।

বিশ বছর আগে, যেবার ধলেশ্বরীতে মোহন মালীর পিনিস ডুবেছিল, সেবার সুন্দর মালীর বয়স ছিল আঠার। তখন তার নরম ঠোঁটে কালো গোঁফের রেখ্ পড়েছে।

মোহন মালীর পরাণভরা যেমনই ছিল শখ, তেমনি সে ছিল নানান কাজের কাজী ও নানান সাজের সাজী। সবাই বলত, 'মোহন মালী বড় কর্মা (কর্মী) মানুষ—কারিগর।'

মোহন মালীর ছেলে সুন্দর মালী শোলার কাজ করত না, ফুলের সাজ সাজাত না। কাজের ধারে-কাছে ঘেষত না। কাজের নামে তার জ্বর আসত। সুরূপনগর থেকে বাপ গন্ধ সাবান এনে দিত। সব সময় সুন্দরের গা থেকে ভুরভুরে বাস ছড়াত।

সুন্দরের গলাখানা বড় মিঠে। মিঠে গলায় বাহার ফুটিয়ে মালী-পাড়ায় ঢালী পাড়ায় বউ-ঝি-যুবতীদের সে গীত শোনাত।

যে বছর মাতানিয়া গাঙে সোনাদানা-ভরা পিনিস ডুবেছিল, তার আগের বছর ভাটির দেশে গিয়ে সুন্দরের বিয়ে দিয়েছিল মোহন মালী। ভাটির দেশ কি একদিনের পথ! তিনটে বড় নদী পেরিয়ে, সাতটা খাল পিছনে রেখে, দশটা বিল ভাটিয়ে, পশ্চিমা বাতাসে তিন দিন তিন রাত উজিয়ে তবে ভাটির দেশ মেলে! ভাটির দেশ কি এইখানে! সে যে সুদূর পরবাস!

মোহন মালী বলত, 'শ্বউরের (শ্বশুরের) ঘর দূরে থাকাই ভাল। সুমুখে থাকলে বাপের লগে বিবাদ হইলে পোলা (ছেলে) গিয়া শ্বউরের ঘরে উঠব। পোলা পর হইয়া যাইব। সাধে কি আর ভাটির দ্যাশে বিয়া দিছি!'

বলত আর খ্যা খ্যা করে হাসত।

জিয়ানিয়া নদীতে মোহন মালীর পিনিস ডুবির পর বিশ বছর পার হয়েছে।

সুন্দরের স্বভাবখানা কিন্তু এক রকমই আছে।

একালে সাজের কাজের আদর নেই। সাজের কাজ জানেও না সুন্দর মালী। কোন কাজেরই কাজী নয় সে। এ কালেব মালীদের মত সে নৌকা বায় না, মাছ মারে না, কৃষাণী করে না। এমন কি চুরিচামারি, কোন উঞ্ছবৃত্তিও তাব স্বভাবে সয় না।

সুন্দর মালী খালি গীত গায়। বিশ বছরে তার মিঠে গলা আবো মিঠে হয়েছে। গলায় এখন সুরের লহর খেলে।

বিশ বছরে বাপের জমানো সব সোনাদানা গিয়েছে। জলটুঙ্গি ছাঁদের একখানা ঘর বেচে খেয়েছে সুন্দব মালী। বাকী ঘবটার আটখানা চালের ছ-খানা গিয়েছে।

মাথার উপর দু-খানা চাল ছিল।

আজ সকালে নিকারীপাড়ার আতাহার-মোতাহার, দুই বাপ-বেটা, দু-খানা চালের একখানা খুলে নিযে গিয়েছে। বিশ টাকায় চালখানা বেচে ফেলেছে সুন্দব মালী।

এখন অনেক বেলা।

ফাল্গুন মাসের রোদের তাপ বাড়ছে। দিনেব তাপ বাড়ছে।

মাতানিয়া গাঙে এখন উজানেব টান। জিরানিয়া ঘাটের বিন্নাবন ভাসিয়ে ধলেশ্বরী তুফান ভাঙে। উজানের টান কি যে-সে টান! দুই কূল ভাসানি সর্বনাশী টান। উজানিয়া খালের পার থেকে সেই টানের ডাক শোনা যায়।

সুন্দর মালী আতাহার-মোতাহারের সঙ্গে খালের ওপারে নিকারী-পাড়ায় গিয়েছিল। আতাহার-মোতাহার—দুই বাপ-বেটা অতবড় চাল মাথায় চাপিয়ে একবারে নিয়ে যেতে পারে নি। সুন্দর মালী নিজে জিরান কাঠের একটা আড়া আর খান তিনেক টিন আতাহারদের বাড়ি পৌছে দিয়ে এসেছে।

হাতের মুঠোয় ঘরের চালবেচা বিশটা কাঁচা টাকা বাজাতে বাজাতে আর গলায় সুরের লহর খেলাতে খেলাতে সুন্দর মালী মালীপাড়ায় ঢোকে। গলাখানা তার যেমন মিঠে, গানের কথাগুলিও তেমনি মিঠে।

যৈবন আইল কন্যার অঙ্গে
সাধের জোয়ার লো,
আমার চৌখের জলে পদ্ম নাচে
টলমল লো।
ও কন্যা, তুমি হইও চান্দোবদন,
আমি হমু মুখের আঞ্চল।
ও কন্যা, তুমি হইও লয়নমাণ
আমি হমু কালো কাজল।

মালীপাড়ার মধ্য দিয়ে সিধা পথ গিয়েছে। বুড়ো কুঞ্জ মালীর ঘরের পিছন দিয়ে পথটা বাঁক ঘুরেছে।

বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে চিটাগুড় দিয়ে তামাক মাখছিল বুড়ো কুঞ্জ মালী। সুন্দর মালীর গান শুনে মাথা তুলল। ডাকল, 'সোন্দর নাকি রে?'

'হ, জেঠা।'

বুড়ো কুঞ্জ মালী সুবাদে সুন্দরের জেঠা হয়।

'শোন্ দেখি।'

'কি কও?'

'ঘরের চালখানা বেচলি বুঝি।'

বুড়ো কুঞ্জর চোখে বড় ধার। বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে সারাদিন বসে থাকে সে। ভুক ভুক করে তামাক টানে। চোখ দুটো তার চরকির মত ঘুরতে থাকে। মালীপাড়ার কোন্ ঘরে কি হয় না হয়, সবই তার চোখে পড়ে।

মাথা নামিয়ে সুন্দর বলে, 'হ, বেচলাম—'

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কুঞ্জ বলে, 'কত দর পাইলি ?'

'বিশ ট্যাকা।'

'ভাল ভাল—'

সুন্দর দুটো হাত সমানে কচলায় আর বলে, 'জেঠা, মনে একখান বাসনা আছে। সাধে কি ঘরের চাল বেচলাম !'

'কি বাসনা !'

'তোমাগর (তোমাদের) সগলরে নিয়া বিষ্যাদবার এট্টু গীতবাদ্যি করুম। কতদিন যে গেরামে গীতবাদ্যি হয় না !'

সুন্দর বলতে থাকে, 'সগলে আমার ঘরে আসব। তাগোব (তাদের) হাতে এট্টু মিঠাই দিতে না পাবলে মনে শান্তি পামু না। এই দিকে হাতে একখান পয়সা নাই। তাই ঘবের চালখান বেচলাম।'

বুড়ো কুঞ্জ মালীর চোখ দুটো চক চক কবে। গান বাজনা, তার উপর আবার মিঠাই মিলবে। তামাক-হুঁকো-কলকি একপাশে রেখে সে উঠে আসে। গান-বাজনার কথায় তার বড উৎসাহ লেগেছে। প্রে বলে, 'বস্ বস্ সোন্দর—'

'অখন বুসুম না জেঠা, রাইতে আসুম।'

'আসিস কিন্তুক—'

'আসুম।'

সামনের দিকে এগিয়ে আসে সুন্দর মালী।
বলে, 'ঘরের চালখানা বেইচা (বেচে) ভাল কবি নাই জেঠা ?'

'ভালই করছিস সোন্দর। গীতবাদ্যি হইব, ভগমানের নাম হইব। সগলের পরাণে আনন্দ দিবি। এর থিকা ভাল কাম পিরথিমীতে আর আছে নাকি ? যত পারবি মানুষেরে আনন্দ দিবি।'

একটু থামে কুঞ্জ মালী। টেনে টেনে দম নেয়। আবার শুরু করে, 'আনন্দই হইল বড় কথা। বিষয়-বাসনায় আমরা জড়াইয়া পড়ছি মাছির লাখান (মত)। আমরা পারি না। কিন্তুক তুই যে আমাগোরে আনন্দ দিস্, এতে ভগমান তুষ্টু হয় ! হে-হে—বুঝলি কিনা।'

খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসতে থাকে কুঞ্জ মালী।

সুন্দরের ঘরের চাল বেচার ব্যাপারে বুড়ো কুঞ্জ মালীর পুরো সায় মেলে। সে বলে, 'গীতবাদ্যির আসরে গেরামের সগলরে নিমন্তন করবি। কেউ যেন বাদ না পড়ে। কিন্তুক—'

'কিন্তুক কি জেঠা?'

'কিন্তুক মালীপাড়ার চন্দর মালীরে ডাকবি না। ও আসলে আমি যামু না। হ, কথাখান মনে রাখিস সোন্দর। ঐ জাতিনাশা ধরমনাশা শয়তানটা যেইখানে থাকব, আমি সেইখানে নাই। সিধা কথাখান সিধা কইরাই (করেই) কইলাম সোন্দর।'

চন্দ্র মালীর উপর ভয়ানক রাগ কুঞ্জর। মালীর ছেলে হয়ে সে ঢালীর মেয়ে বিয়ে করেছে। এতে মালীদের জাত গিয়েছে, ধরম গিয়েছে।

হঠাৎ বুড়ো কুঞ্জ চোখ কুঁচকে ডাকে, 'এই সোন্দর—'

'কি কও জেঠা?'

'শোনলাম, চন্দর নাকি সুবাসীর লেইগা (জন্য) সম্বন্ধ দেখতে গেছে বাজিতপুর।'

'আমি তো জানি না। তুমি শুনলা কার মুখে?'

শয়তানী চালে হাসে কুঞ্জ মালী। বলে, 'আমার কানে, চোখে —সগল জায়গায় বড় ধার। এই বারান্দায় বইসা (বসে) আমি সগল টের পাই। সগল দেখি, সগল শুনি।'

একটু থামে। তারপর ফিসফিস করে বলে, 'যখন ঢালীর মাইয়া বিয়া করতে যায়, তখন না করছিলাম চন্দররে। শয়তান আমার কথাটা শুনল না। অখন নিজের মাইয়া কেমনে বিয়া দেয়, দেখুম।'

বুড়ো কুঞ্জর মুখে ধূর্ত হাসি লেগেই থাকে।

॥ এগার ॥

স্থন্দরের বউর নাম বাতাসী। উঠানের এক কিনারে বসে উদাস চোখে, একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। ফাল্গুনের রোদের তাতে গা যেন পুড়ে যায়। তবু বাতাসীর হুঁশ নেই।

বাতাসীর ঘোমটা খসা, রুখাশুখা চুল। তাকে দেখলে বোঝা যায়, একটু আগে সে খুব কেঁদেছে। চোখের কোলে আর সামনেব শুকনা মাটিতে লোনা জলের দাগ শুকিয়ে রয়েছে। নাকের ডগাটি তির তির করে কাঁপছে।

স্থন্দর মালীকে দেখে বাতাসী উঠে দাঁড়াল।

স্থন্দর মিটি মিটি হাসে। ডাকে, 'বউ, ঘরে আয়—'

বাতাসী ফুঁসে উঠল, 'আ গো পুরুষ, কোনখানে উঠুম! ঘর কইতে কিছু কি রাখছ?'

স্থন্দর মালীর হাসি মরে না। দুই ঠোঁটে আঠার মত লেগে থাকে। স্থন্দরের হাসি, কথা—সবই মিঠে। মিঠে হেসে সে বলে, 'বউ নি ক্ষেপছিস্?'

'আমি ক্ষেপলে তোমার কি গো পুরুষ!'

বাতাসী উঠানের কিনার ছেড়ে নড়ে না। তার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে দিয়ে হু-হু শ্বাস পড়ে।

বাতাসী আবার বলে, 'সারা জন্ম কাম-কাজ কারে কয়, জানলা· না। ঘরের সোনাদানা, খাটপালং (পালঙ্ক), সগল বেইচা (বেচে)

খাইলা। শ্যাষে শ্বউরের ঘর বেচা ধরছ। একখান ঘর খাইছ। আর এক ঘরের সাতখান চাল বেচলা। হা ভগমান, এমুন মানুষের হাতে আমারে দিছিলা!'

সুন্দর কিছু বলে না। খালি হাসেই।

বাতাসী ক্ষেপে ওঠে, 'আ গো, অমন সব্বনাশা হাসি হাইসো (হেসো) না। অমন হাসি দিয়াই তো আমার সব্বনাশখান করলা। আমার সব্বস্ব খাইলা। হাসি দেখলে পরাণ আমার শুকাইয়া যায়।'

এবারও কথা বলে না সুন্দর মালী।

বাতাসী বলতেই থাকে, 'বিশ বচ্ছর আমাগোর বিয়া হইছে। কও দেখি পুরুষ, গতরে খাইটা (খেটে) কয়খান পয়সা ঘরে আনছ! সোনাদানা, ঘরত্নয়ার, সগল খাইছ। চাইয়া (চেয়ে) ছ্যাখ, শ্বউরের ভিটা কেমুন খা খা করে। চাইর (চার) দিকে কেমুন অলক্ষ্মী লাগছে! এই পুরাতে আমি আর থাকুম না!'

সুন্দর মালী বলে, 'আনন্দ কর বউ, আনন্দ কর। বিষ্যুদবার গীতবাদ্যির আসর বসামু। গেরামের সগলে আসব। তাগোর (তাদের) হাতে যদি এট্টু মিঠাই দিতে না পারি, তা হইলে দেখায় কেমুন? সেই লেইগাই তো ঘরের চাল বেচলাম। সগল ঠিক হইয়া যাইব বউ—'

'ঠিক হইব আমি মরলে। এ কি রাজার গোলা! হৌক রাজার গোলা, রাজার গোলাও ঝিনুক দিয়া মাইপা (মেপে) খাইলে ফুরায়। ভগমান কপালে যে কি লিখছে!'

বাতাসী ছুই হাতে সমানে কপাল চাপড়ায়।

বাতাসীর ছু-খানা হাত ধরে ফেলে সুন্দর মালী। বলে, 'করিস কি বউ, তুই কি পাগল হলি?'

'পাগল হইলে তো বাঁচতাম। তোমার স্থখের বান ডাকত। দশ হাতে ভিটামাটি বেইচা (বেচে) বিশ হাতে খাইতে পারতা।'

সুন্দর মালীর হাত থেকে নিজের হাত ছু-খানা ছাড়িয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদে বাতাসী। উঠানে পড়ে লুটায়, গড়াগড়ি খায়। মরা শ্বশুরের

নামে বিলাপ করে, 'শ্বউর গো, এমুন পোলার (ছেলের) হাতে আমারে রাইখা (রেখে) গেছিলা! স্বগ্‌গ থিকা তুমি ছাখ, গুণের পোলা (ছেলে) তোমাব ভিটার কি দশা করছে!'

সুন্দর মালী বলে, 'কি করিস বউ, মাথাখান এট্টু থির কর। পাগলামি করিস না।'

বাতাসী কিছু বলে না। আলুথালু হয়ে গড়াগড়ি খায়। লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদে।

সুন্দরও আর কথা বাড়ায় না। তুই হাতে বখারি পাখির মত বাতাসীর হাল্‌কা দেহটা পাঁজাকোলে তুলে নেয়। জলটুঙ্গি টাদের ঘরের একমাত্র চালখানাব তলায় বাতাসীকে নামিয়ে দিয়ে বলে, 'বিষ্যুদবাব আমার উঠানে গীতবাগ্তির আসব বসব। গেবামেব পাঁচজন আসব। চিতই পিঠা বানাবি, মিষ্টান্ন বানাবি, সিদ্ধ পুলি পিঠা বানাবি। সগলে খাইয়া যেন তুষ্টু (সন্তুষ্ট) হয়।'

বাতাসী এখন আর কাঁদে না। কেঁদে কেঁদেই তো তাব সাবাটা জীবন কাটছে! কিন্তু সুন্দর মালীর স্বভাব তাতে বদলাচ্ছে কই।

ঘরের একমাত্র চালটার তলায় জিরাণ কাঠের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে সামনের উজানিয়া খালটার দিকে উদাস চোখে চেয়ে থাকে বাতাসী। বুঝি বা নিজের অদৃষ্টেব কথাই ভাবে। সোয়ামী তুটো পয়সা ঘবে আনে না। আর দশ জনের সোয়ামী খাটে, পরিশ্রম কবে, গৌববেব পয়সা কামাই করে ঘরে আনে। বাতাসীর কপালেই যত তুঃখ লিখেছিল ভগবান। সুন্দর একটা পয়সা কামায় না। কাবো সামনে মুখই তুলতে পারে না বাতাসী। যার সোয়ামী রোজগার করে না, তার উঁচু গলায় কথা বলার জোব কোথায়?

উদাস চোখে চেয়েই থাকে বাতাসী। এখন আর কাঁদে না, লুটোয না, গড়াগড়ি খায় না। খালি ভাবে, অদৃষ্টে এতটুকু সুখও যদি থাকত, তা হলেও মনকে বুঝ মানানো যেত।

বাতাসীর বুকের ভিতর কি তুঃখ যে দিবানিশি বাজে! তা যদি

বুঝত সুন্দর মালী ! পুরুষ মানুষ অবুঝ হলে মেয়েমানুষের যে কি জ্বালা, তা বোঝার মনই নেই সুন্দরের।

সুন্দর মালী বলে, 'তুই এট্টু বস্ বউ, আমি গেরামের পাঁচজনেরে নিমন্তন কইরা (করে) আসি। কুঞ্জ জেঠায় চন্দর ভাইরে নিমন্তন করতে না করছে। গীতবাদ্যি হইব, তাগোরে (তাদের) না কইয়া (বলে) পারুম না।'

সুন্দর মালী উজানিয়া খালের সাঁকো পার হয়ে ওপারে চলে যায়। বাতাসী এতটুকু নড়ে না ; খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসেই থাকে।

উজানিয়া খালের পারে বাস হয়েও সুন্দর মালীর স্বভাবখানা চিরটা কাল ধলেশ্বরীর মত একই থাকে।

॥ বার ॥

রবিকাটা ফসলেব মাঠগুলি এখন খা খা কবে। তিল, মুগ, মটর কাটা হয়ে গিয়েছে। কাটা ফসলের গোড়াগুলি রোদের তাতে সারাদিন শুকায়। হিমের জলে সাবা বাত ভেজে।

ফাল্গুন মাস চলে গিয়েছে।

এমন দিনে মাতানিয়া গাঙে উজানের টান কমে, ভাটির টান বাড়ে। চৈত্র মাসের বাতাসে তুফান ওঠে উথলপাথল। মাতানিয়া গাঙ সব সময় মেতেই থাকে। জলে কুটো পড়লে এখন খান খান হয়ে ভাঙে।

আগের দিন বাজিতপুরে মালীপাড়ায় গিয়েছিল চন্দ্র মালী। সুবাসীর সম্বন্ধের কথা বলে, নতুন মালীদের ঘরে খেয়ে ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়েছিল।

এপারে পৌঁছে সুখচাঁদপুরের এক সওয়ারী মিলেছিল। সওয়ারী এক মৌলবী সাহেব। সুখচাঁদপুরে মৌলবী সাহেবের বড় ঠেকার কাজ। তার বাপজানের নাকি এন্তেকাল। বুড়ো বাপ মরলে তালুক-মুলুক, বিষয়-আষয় ভাই শরিকেরা দখল করে বসবে। মৌলবী সাহেবের তাই বড় চিন্তা। মরার সময় বুড়ো বাপজানের কাছে থাকা বড় দরকার।

অগত্যা মৌলবী সাহেবকে নিয়ে সুখচাঁদপুর যেতে হয়েছিল চন্দ্র মালীকে। সকাল বেলায় সুখচাঁদপুরে সওয়ারী নামিয়ে পাঁচটা টাকা

মিলেছে। সওয়ারী নামিয়েই বাদাম টাঙিয়ে উল্টোদিকে নৌকার মুখ ঘুরিয়েছে চন্দ্র মালী। উজানের টানে নৌকা ছোটে শাহী মেজাজে; পালের কাপড়ে পশ্চিমা বাতাস বাজে সাঁই সাঁই।

এইমাত্র জিরানিয়া ঘাটে এসে চন্দ্র মালীর নৌকাখানা ভিড়ল। এখন দুপুর।

চৈত্রের রোদে নদী জ্বলছে, আকাশটা যেন ঝলসে যাচ্ছে।

সমস্ত রাত ধলেশ্বরী তিনবার পাড়ি দিয়েছে চন্দ্র মালী। আলস্যে, ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। নৌকার গলুইতে বসে থাকতে থাকতে কোমরটা ধরে গিয়েছে। চোখজোড়া টকটকে লাল।

ফসলকাটা মাঠের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পা আর চলতে চায় না চন্দ্র মালীর। হঠাৎ তার চোখে পড়ে, চকের সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কাঁখে কলস নিয়ে সুবাসীর মা চলেছে।

মুহূর্তে সারা দেহের আলস্য আর দুই চোখের ঘুম ছুটে যায়। জোরে-জোরে পা চালিয়ে দেয় চন্দ্র মালী। মাঠটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে সুবাসীর মায়ের সঙ্গ ধরে।

সুবাসীর মায়ের যে এতটা বয়স হয়েছে, পিছন থেকে বোঝাই যায় না। শরীরের বাঁধন যৌবনকালের মতই অটুট আছে। দীঘল চুলগুলি কোমর ছাপিয়ে নিচে নেমে পড়েছে। চলার তালে-তালে সুবাসীর মায়ের সুঠাম কোমর দুলে দুলে চন্দ্র মালীর চোখে যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে।

সুবাসীর মায়ের নাম ফুলটুসি। ফুলটুসি ঢালীর ঘরের মেয়ে। ঢালীর মেয়েকে পিরীত করে বিয়ে করেছে চন্দ্র মালী। মালীর সঙ্গে ঢালীর বিয়েতে গ্রামে নানা কথা রটেছিল। গ্রামের মানুষ কম দুঃখ দিয়েছে তাদের! সুবাসীর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সব দুঃখ সয়েছে চন্দ্র মালী। সমস্ত জ্বালা সহ্য করার সাহস পেয়েছে।

এখনও, এই বয়সে চন্দ্র মালীর দেহে আর মনে ভাটির টান ধরেছে, তখনও সুবাসীর মাকে দেখে সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলির কথা মনে পড়ে। রক্তের ভিতর সেই দিনগুলি যেন চমক দিয়ে ওঠে।

নতুন যৌবনের গরবিনী ফুলটুসি সেদিন তার দুচোখে মোহ ধরাত। আজও সেদিনের সেই মোহ ঘুচে যায় নি।

এদিক সেদিক তাকায় চন্দ্র মালী। দুই চোখ যতদূর যায়, কেউ নেই। প্রথম বয়সের মাতানিয়া ডাকটা আপনা থেকেই গলায় ফোটে। বড় মিঠে গলায় চন্দ্র মালী ডাকে, 'ফুলটুসি—'

সুবাসীর মা চমকে ওঠে। নির্জন দুপুরে ফসলকাটা মাঠে নাম ধরে কে ডাকে। মাটির কলস মাজায় নিযে চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় সুবাসীর মা। দুই ঠোঁটের ফাঁকে বড় সুখের একটি চিকণ হাসি ফুটি ফুটি করে। বুকের ভিতর সোহাগের লতা থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে থাকে। কিন্তু দুই চোখে নকল রাগের তাপ ফোটে।

সুবাসীর মা বলে, 'তুমি!'

'হ। অন্য মানুষ আসার কথা আছিল (ছিল) বুঝি! এমুন দুকার (দুপুর) বেলা, কোনখানে একটা মানুষ নাই। এমুন সুযুগ—'

চন্দ্র মালী মিটি মিটি হাসে।

'আ গো, রঙ্গ রাখ। ডাক শুইনা (শুনে) ডরে মরি। বুকখান তির তির কইরা কাঁপে।'

'কাঁপে বুঝি।'

আর কথা বলে না চন্দ্র মালী। মুগ্ধ চোখে একদৃষ্টে সুবাসীর মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুবাসীর মায়ের বুকে যে সোহাগের লতাটা থরথরিয়ে কাঁপছিল, সেই কাঁপুনি এখন শতগুণে বাড়ে। কাঁপা কাঁপা গলায় সুবাসীর মা বলে, 'অমন কইরা (করে) আমার দিকে যে চাইয়া (চেয়ে) থাক! জিগাই (জিগ্যেস করি), বয়সখান বাড়ে, না দিন দিন কমে!'

'তোর দিকে চাইলে কি বয়সের কথা মনে থাকে লো বউ। তুই আমার নয়া বয়সের সেই যৈবনবতীই আছিস!'

কথায় কথায় রঙ্গঠমকে সুবাসীর মা আর চন্দ্র মালী মালীপাড়ায় গিয়ে ঢোকে।

বারান্দায় বিড়ার উপর কলস নামিয়ে সুবাসীর মা বলে, 'সারা পথ তো রঙ্গ কইরাই (করেই) আসলা। আসল কথা তো কইলা (বললে) না।'

'কিসের আসল কথা বউ?'

'আ গো পুরুষ, কেমুন ভুলের মন তোমার! কাইল হাটে যাওনের সময় কী কইছিলাম?'

'মাছ, পান, খর (খয়ের) সুপারী আনতে কইছিলি (বলেছিলি)। হাট থিকা সগল কিনছিলাম। মাছ পইচা (পচে) গেছে : ফেলাইয়া দিছি।'

একটু থেমে চন্দ্র মালী। বলে, 'ধর—'

একটা কাপড়ের পুঁটুলি, যার মধ্যে পান, খয়ের আর সুপারী আছে, সুবাসীর মায়ের দিকে বাড়িয়ে দেয় চন্দ্র মালী।

'আর কিছু কই (বলি) নাই?'

দুই চোখে বিস্ময় ফোটে সুবাসীর মায়ের।

'আর কী কইছিস?'

'মা গো, আক্কলনাশায় কয় কি! সুবাসীর লেইগা (জন্য) নদীর ঐ পারে সম্বন্ধ দেখতে কই (বলি) নাই?'

'এ হেঃ, এক্কেবারে ভুলছি।'

নিপাট ভাল মানুষের মত বলে চন্দ্র মালী।

কিছুক্ষণ সোয়ামীর মুখের দিকে চেয়ে সুবাসীর মা তার মতলব ধরে ফেলে। বলে, 'তুমি রঙ্গ কর, মিছা কও।'

এইবার চন্দ্র মালী হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, 'মিছা কই (বলি), কেমনে বুঝলি বউ ?'

'আ গো পুরুষ, পরথম যৈবন থিকা তোমার লগে ঘর করি! এতদিনে তোমারে চিনুম না। তোমারে আমি চিনি।'

সুবাসীর মা এগিয়ে আসে। উতলা হয়ে বলে, 'বাজিতপুরে পোলার (ছেলের) খোঁজ পাইলা ?'

'পাইলাম।'

'কেমুন পোলা (ছেলে) ?'

'অমন উতলা হইস না বউ। গাঙ পাড়ি দিয়া আসলাম। চোখে ঘুম ভাইঙা (ভেঙে) আসে। এট্টু জিরাইয়া লই, তারপর সগল কমু।'

বারান্দায় উঠে কাঁচা বাঁশের বেড়ায় ঠেসান দিয়ে বসে চন্দ্র মালী। রেখ্‌কাটা গামছাখানা নেড়ে নেড়ে বাতাস খায়।

চৈত্রের বাতাস পাক খেতে থাকে। পাক-খাওয়া বাতাস ফসলকাটা চকের উপর দিয়ে ছোটে। শূন্য চকে ধূলা আব শুকনো পাতা একাকাব হয়ে কুণ্ডলী পাকায়। অনেক দূরে জিবানিয়া ঘাটে বোদেব হল্‌কা থর থর করে কাঁপে।

সুবাসীর মা বলে, 'আ গো, কও, এই কি তোমাব জিরানেব সময়। আগে সম্বন্ধের কথা কও। তারপব ছান (স্নান) কব। খাও, ঘুমাও।'

'শুনবিই তবে ?'

সুবাসীব মা আকুল হয়ে ওঠে, 'শুনুম, শুনুম, শুনুম। আ গো পুরুষ, কও। রঙ্গ তোমাব কোনকালে যাইব না। কও গো, কও—'

'তা হইলে এক ছিলুম তামুক সাজ।'

সুবাসীর মা তামাক সাজে। চন্দ্র মালী চেয়ে চেয়ে দেখে।

ভুক ভুক করে তামাক টানতে টানতে চন্দ্র মালী বলে, 'পোলা (ছেলে) বড় বাহারের বউ। আমাগোর (আমাদের) সুবাসীর লগে যা মানাইব !'

'পোলার (ছেলের) বাপ কী কইল ?'

'বাপের লগে কথা হয় নাই। ঠাকুরদাদার লগে হইছে। তোরে কই (বলি) নাই, মাইয়া যখন জন্মাইছে, জামাইও জন্মাইছে। অত আকুল হইস না। তুই তো আমার কথা মানিসই না। আমার কথা বাসি হইলে মিঠা লাগে।'

তামাক টানে আর ভুক ভুক করে ধোঁয়া ছাড়ে চন্দ্র মালী।

সুবাসীর মা বলে, 'অনেক হইছে। এইবার পোলার (ছেলের) কথা কও।'

'কইলাম তো, পোলা (ছেলে) বড় বাহারের। বিষ্যুদবার হাট ফিরত তারা মাইয়া দেখতে আসব।'

তামাক টেনে টেনে মৌতাত জমিয়ে ফেলে চন্দ্র মালী। আধো বোঁজা চোখে চায়। আর বলে, 'বাজিতপুরের মালীরা বড় ভাল মানুষ। নয়া কুটুম নিয়া সুখ পাবি সুবাসীর মা।'

কথায় কথায় বেলা হেলতে থাকে। রোদের তাপ জুড়োতে থাকে।

॥ তের ॥

এক সময় স্থন্দর মালী আসে। সম্পর্কে স্থন্দর চন্দ্র মালীর ভাই।

হুঁকো নামিয়ে চন্দ্র মালী বলে, ‘আয় সোন্দর—বস্ বস্—’

বেড়ার গায়ে একখানা ছোট জলচৌকি ঠেসান দেওয়া রয়েছে। সেটা স্থন্দরের দিকে এগিয়ে দেয় চন্দ্র মালী। আবার বলে, ‘হেলন্তি বেলায় (যে বেলা হেলে পড়েছে) কি মনে কইরা আসলি সোন্দর ?’

তোমারে নিমন্তন করতে আসছি।’

চন্দ্র মালী খাড়া হয়ে বসে। বলে, ‘কিসের নিমন্তন ?’

‘বিষুদবার আমাগোর (আমাদের) বাড়িত্ গীতবাদ্যির আসব হইব। সগলরে নিয়া সেইখানে যাইবা। সেইখানে খাইবা। গেরামের সগলেরে নিমন্তন করছি।’

চন্দ্র মালী বলে, ‘তোর অবস্থা তো জানি। সগলেরে যে খাওয়াবি, অত টাকা পাবি কোনখানে ?

স্থন্দর মালী হাসে। কথা বলে না।

চন্দ্র বলে, ‘ক’ (বল) সোন্দর, টাকা পাইলি কোনখানে ? কাম-কাজ করস নাকি ?’

‘কাম করি না ভাই। ঘরের একখান চাল বেচছি।’

আস্তে আস্তে বলে স্থন্দর মালী। মুখ নামিয়ে বসে থাকে। চন্দ্রর মুখোমুখি তাকাতে ঠিক ভরসা পায় না।

'ঘরের চাল বেইচা (বেচে) গীতবাদ্যি করবি ! তোর লগে আমার কোন সম্ভন্ধ নাই। তোর বাড়িত্ যামু না।'

'সগলেরে নিয়া এট্টু আনন্দ করুম—'

চন্দ্র মালী ক্ষেপে ওঠে, 'পয়সা রোজগার করস না, তোর আবার আনন্দ কি রে বান্দর (বাঁদর) ! গলায় দড়ি দিয়া মর।'

একটু থামে চন্দ্র মালী। সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে ওঠে, 'সগলেরে নিয়া আনন্দ করবি ! যখন না খাইয়া মরবি, একখান পয়সা কেউ দিব ! পেরথিমীর রীত বুঝিস ! সগলে নিব, কেউ দিব না।'

সুন্দরের মুখ কাচুমাচু হয়ে যায়। চন্দ্র মালীর দু-হাত ধরে সে বলে, 'ভাই গো, ঘরের চাল বিকি (বিক্রি) করনে গোসা হইছ ?'

'না, পরাণে বড় আনন্দ হইছে।'

'গোসা হইও না চন্দর ভাই। তুমি দেইখ্যা (দেখে) নিও, এই শ্যাষ, আর ঘরদুয়ার বেচুম না। তোমার লগে নৌকা বাওয়ার কাম করুম।'

'সত্য কইস (বলিস) ?'

'তোমার পা ছুঁইয়া (ছুঁয়ে) কিরা কাইটা কই (দিব্যি দিয়ে বলি)।'

'মনে থাকব তো।'

'থাকব।'

চন্দ্র মালী আস্তে আস্তে বলে, 'যামু বিষ্যুদবার।'

সুন্দর এবার চন্দ্রর কাছে ঘেঁষে বসে। তার কানে মুখটা গুঁজে দিয়ে বলে, 'একখান কথা শুনছ ভাই ?'

'কি কথা ?'

'হায় হায় গো, কুঞ্জ জেঠায় কি কয় জান ?'

'কি কয় ?'

'তোমারে নিমন্তন করলে তাগোরা (তারা) গীতবাদ্যির আসরে যাইব না।'

চন্দ্র মালীব চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে ওঠে। বাগে মুখ দিয়ে কথা সরে না।

সুবাসীর মা বারান্দাব খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। চুপচাপ দু-জনেব কথা শুনছিল। হঠাৎ সে বলে বসে, 'ক্যান, যাইব না ক্যান?'

'তোমাগোর (তোমাদেব) লগে যে তাগোর (তাদেব) বিবাদ। তুমি মালীর পুত হইয়া ঢালীব মাইয়া বিয়া করছ। তোমাব নাকি জাতি গেছে, ধরম গেছে। এতকাল বিয়া হইছে তোমাগব (তোমাদেব)। রাগখান কিন্তুক ভোলে নাই কুঞ্জ জেঠায়। মনে মনে পুইষা বাখছে।'

আপন মনেই মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সুন্দর মালী বলে, 'আমি জাতি ধরম মানি না। সগলই আমাব সমান।'

চন্দ্র মালী দাঁতে দাঁত ঘষে। বলে, 'ঢালীর মাইয়া বিযা কবছি আমি। আমি তাব ভাতে না কাপড়ে! না তাব চালেব তলে আমাব চাল! তাব পাকা ধানে কি আমি মই দিছি, না তাব বাড়া ভাতে ছাই দিছি! আমাব উপুব তাব বাগ ক্যান?'

একটু থামে চন্দ্র। উত্তেজনায় টেনে টেনে দম নেয। তাবপব বলে, 'আমি কি তাব বাগেব কড়ি ধাবি?'

কাল সমস্ত বাত্রি এক মুহূর্ত ঘুমায় নি চন্দ্র মালী। নৌকা নিয়ে ধলেশ্বরীতে এপাব-ওপাব করেছে। বাগে, দুঃখে বাতজাগা চোখ দুটো ফেটে যেন এই মুহূর্তে বক্ত ছুটবে। উত্তেজনায শবীবটা থর থর কবে কাঁপছে।

সুবাসীব মা বলে, 'আ গো, গোসা হইও না। গোসা হইবা কাব উপুর? তেনায (তিনি অর্থাৎ কুঞ্জ মালী) আমাগোর বিয়া পবথম (প্রথম) থিকা মন্দ চোখে দেখছে। বিশ বছর আমাগোব বিয়া হইছে। কত কথা শুনছি, কত গঞ্জনা সইছি। ক্ষেইপো না। মাথাখান থির কর, ধীর হও।'

চন্দ্র মালী আব কথা বলে না। ক্যাঁচা বাঁশের বেড়ায় ঠেসান দিয়ে বড় দুঃখে, বড় অভিমানে চোখ বুঁজে বসে থাকে।

এ কি দু-একদিনের কথা। বিশ বাইশ বছর আগের কথা। ঢালীর মেয়ে ফুলটুসির সঙ্গে মালীর ছেলে চন্দ্রর পিরীত হল। মালীপাড়ায়, ঢালীপাড়ায়, ধলেশ্বরীর এ পারে এই ছত্রিশ জাতের গ্রামে কত কথা উঠল, কত রটনা রটল। কিন্তু পিরীতির রীতিই যেন কেমন। যৌবনে ঢালীর মেয়ে আর মালীর ছেলের বুকের ভিতর যে সাধের পিরীতি জন্মাল, তা কি মানুষের মুখের কথায় ভাঙে! পরাণে পরাণে যে ফাঁস পড়ে, তা কি রটনায় ছেঁড়ে।

ধলেশ্বরীপারের এই গ্রাম, আর তার হাজার আচার বিচার, ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে ঢালীর মেয়ে আর মালীর ছেলের পিরীত অব্যাহত রইল। একদিন তাদের বিয়েও হল।

ঢালী-মালীর বিয়ে কেউ সুনজরে দেখে নি। তবু কালে কালে তাপ জুড়াল, সবার গোসা পড়ল, রটনা থামল। কিন্তু বিশ বাইশ বছর ধরে সমানে রাগ পুষে আসছে বুড়ো কুঞ্জ মালী। সে এই অনাচার মানিয়ে নিতে পারে নি। দিবানিশি তার বুকের তলায় তুষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে।

কুঞ্জ মালী মালীপাড়ার পুরনো আমলের মানুষ, সুবাদে চন্দ্র মালীর জেঠা হয়। তাকে অগ্রাহ্য করে যে চন্দ্র ঢালীর মেয়েকে বিয়ে করবে, এ কথা কল্পনাও করতে পারে নি বুড়ো কুঞ্জ। তাই চন্দ্রর উপর তার রাগটা দিনে দিনে বেড়েই চলে। সুযোগ পেলে চন্দ্রকে সে বুঝিয়ে ছাড়বে, তাকে অগ্রাহ্য করার ফল কী?

কুঞ্জ বলত। এখনও বলে, 'ক্যান মালীর ঘরে মাইয়া আছিল (ছিল) না? ঢালী হইল ছোট জাতি। মালীরা উচা (উঁচু) জাতি। ছোট জাতির লগে বিয়া হইলে আমাগোর জাতি যায়, মান যায়। সেই আক্কেল নাই চন্দরের। শয়তান, বংশের নাম ডুবাইছে। ওর লগে আমার সম্বন্ধ নাই।'

বেলা অনেকটা হেলেছে। ফসলকাটা খা খা চকটা এখন বড় করুণ দেখায়।

হঠাৎ সুন্দর মালী বলে, 'ভাই গো একখান কথা—'

কি কথা ?

'কাইল (কাল) কি বাজিতপুরে সুবাসীর সম্বন্ধ দেখতে গেছিলা ?'

'হ, কে কইল তোরে ?'

চন্দ্র মালী চমকে উঠল। বেড়ার গায়ে ঠেসান দিয়ে খাড়া হয়ে বসল। বলল, 'কার মুখে শুনলি সোন্দর ?'

'কুঞ্জ জেঠা কইল (বলল)।'

'এই কথা তো কেউ জানে না। কুঞ্জ জেঠা জানল কেমনে ?'

চন্দ্র মালীর মুখখানা থম থম করে।

অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলে না।

বেলার মনে বেলা যায়।

ফসলকাটা চকটার দিকে শূন্য চোখে চেয়ে থাকে চন্দ্র মালী। সুবাসীর মা ঘরে ঢোকে।

গলা নামিয়ে সুন্দর মালী বলে, 'চন্দর ভাই, আর একখান কথা কই—'

মুখে কিছুই বলে না চন্দ্র। ফসলহীন ন্যাড়া মাঠ থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে সুন্দরের মুখে রাখে।

সুন্দর বলে, 'হাবেভাবে আর কথায় মনে হইল, কুঞ্জ জেঠায় সুবাসীর বিয়ায় বাধা দিব।

হঠাৎ চন্দ্র মালী চেঁচিয়ে ওঠে। তার লাল, টকটকে চোখ দুটো ফেটে যেন রক্ত ছুটবে। সে বলে, 'তুই তারে কইস, সুবাসীর বিয়া আমি দিমুই। বৈশাখ মাসের মধ্যেই দিমু। কুঞ্জ জেঠা পারলে যেন ঠেকায়। আমাগোর (আমাদের) নামে যা কইছে, সগল সইছি। মাইয়ার নামে কলঙ্ক দিলে আমি কিছুতেই সমু না। মাইয়া আমার সতী।'

চন্দ্র মালীর চেঁচানিতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে সুবাসীর

মা। বলে, 'ক্ষেইপো (ক্ষেপা) না, আ গো, মাথাখান থির কর, ধীর কর।'

'আর পারি না বউ। আমি সারা জনম সইছি, সারাটা জনম মুখ বুঁইজা আছি। মাইয়ার নামে কালি দিলে বাপ হইয়া কেমনে সহ্য করুম? এই শত্তুরতা কি সওয়া যায়!'

সুবাসীর মা তবু বলে, 'ক্ষেইপো (ক্ষেপো) না, আ গো, এমুন সময় ক্ষেপতে নাই। আর কথায় কাম নাই। ছান (স্নান) করতে যাও। বেলা তো গেল! খাইবা না?'

'ছান (স্নান) খাওন আমার ঘুচছে। পরাণে শান্তি না থাকলে কিছুতে কি সুখ থাকে বউ! মাইয়ার নামে কথা উঠলে আমি সমু না; আমি মরুম। সেই কথা শোননের আগে আমি মাতানিয়া গাঙে ডুব দিয়া সগল জ্বালা জুড়ামু। তুই দেখিস!'

রাগে দুঃখে দু-চোখ ফেটে লোনা জল ঝরতে থাকে চন্দ্র মালীর। টেনে টেনে হিক্কার মত শব্দ করে করে শ্বাস নেয় সে। বুঝি বা মনে মনে ভাবে, জ্ঞাতি শত্রুর পাশে বাস করার মত দুর্ভাগ্য আর নেই।

খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে রাত হয়ে যায়। আকাশে ফিনিক ফোটা চাঁদের আলো দেখা দিয়েছে।

এখন আর সেই উত্তেজনা নেই। রাগটা অনেক জুড়িয়েছে। মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে। ভুক ভুক শব্দ করে হুঁকো টানছে চন্দ্র মালী। তার মুখোমুখি বসে পান সাজছে সুবাসীর মা।

কথায় কথায় সুবাসীর সম্বন্ধের কথা উঠল।

সুবাসীর মা বলল, 'কেমুন পোলা (ছেলে), দেখতে কেমুন, কিছুই তো কইলা (বললে) না তখন!'

'শুনবি?'

'শুনুম না? জামাই যে হইব, তার কথা কেউ না শোনে?'

আগ্রহে চোখ দুটো চক চক করে সুবাসীর মায়ের।

'পোলা (ছেলে) বড় বাহারের। তোগো (তোদের) মা-বেটি, দুই জনেরই মনে ধরব।'

'কি যে কও, মুখে তোমার কিছুই বাধে না!' সুবাসীর মা বলতে থাকে, 'বিষুদবার হাট ফিরতি তো তারা মাইয়া দেখতে আসব?'

'হ।'

'কয়জন আসব? কে কে আসব?'

'আসব পাঁচ দশ জন। পোলার (ছেলের) ঠাকুরদাদায় আসব, মনে হয়।'

ঘরের মধ্যে থেকে সব শোনে সুবাসী।

ঘরের বাইরে বারান্দার বেড়ায় ঠেসান দিয়ে ভুক ভুক করে হুঁকোর মুখে সুখের টান দিতে থাকে চন্দ্র মালী।

বাতাস পাক খায়। পাক খাওয়া বাতাস নিঃস্ব মাঠের দিকে ছুটে যায়। অনেক, অনেক দূরে জিরানিয়া ঘাটের কাছাকাছি ফিনিক ফোটা চাঁদের আলোটা আবছা রহস্য হয়ে রয়েছে। আলোটা যেন সেখানে থর থর করে কাঁপছে। শূন্য দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে চন্দ্র মালীর হুঁকো টানার একটানা ভুক ভুক শব্দটা শুনতে থাকে সুবাসী।

॥ চোদ্দ ॥

জিরানিয়া ঘাটের পাশে সারি সারি মান্দার গাছ। গাছগুলি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বড় ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গাছের ছায়ায় বসে আছে অনঙ্গ।

ধলেশ্বরী ঢিমা তালে বয়ে চলেছে।

দিনটা যায় যায়। পশ্চিম আকাশে এখন আর সূর্যটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রোদের আয়ু আজকের দিনের মত ফুরিয়ে গেল। সারাটা দিন বিপুল আকাশটাকে পাড়ি দিয়ে ঠিক এই সময় সূর্যটা যে কোথায় যায়, অনঙ্গ তার হদিস পায় না।

সামনের নদী আবছা হয়ে আসছে। ঝুরু ঝুরু বাতাসে লাল লাল মান্দারের ফুলগুলি ঝরে পড়ে। নদীর পারে কেউ নেই। যতদূর তাকানো যায়, নদীর বুকে নিঃশব্দ ভাটির স্রোত। আর পারের নরম কাদায় কাদাখোচা পাখিগুলি ঠোঁট খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বৃথাই কি যেন খুঁজে মরে।

দুদিন হল সুজন মাঝি সওয়ারী এবং নৌকা নিয়ে মেঘনার দিকে পাড়ি জমিয়েছে। এখনও ফেরে নি। যতক্ষণ সে সোনারঙে থাকে, অনঙ্গকে নিয়ে মেতে থাকে। একা একা কোথাও গিয়ে যে বসবে, সে ফুরসত মেলে না অনঙ্গর।

এখন এই নির্জন, নিঃশব্দ, নদীর পারে বসে নিজের কথাই অনঙ্গ ভাবছে। তিন বছর আগে ধলেশ্বরীর ওপার থেকে এপারে এসেছিল

সে। সুরূপনগর থেকে এই সোনারঙে। সুজন মাঝির হাত ধরে এই জিরানিয়া ঘাটেই নেমেছিল।

তিন বছর আগের সেই দিনটাতে আর এই দিনটাতে কত তফাত! সেই দিনের কিশোর অনঙ্গ এখন যুবক হয়েছে। ঠোঁটে চিকণ গোঁফের রেখ্ পড়েছে। বুকের ভিতর যুবক বয়সের আকুলি-বিকুলি জেগেছে।

অনঙ্গ ভাবে, তিন বছর ধরে সে এই সোনারঙে রয়েছে। যেদিন ব্রজবাসীর ইচ্ছা হবে, তাকে এই গ্রাম থেকে নিয়ে যাবে। চিরদিনের মত এই গ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচবে।

ব্রজবাসীর মনে কি আছে, অনঙ্গ জানে না।

সামনের নদীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কত কথাই না ভাবে অনঙ্গ।

ধলেশ্বরীর পারে তার জন্ম। জন্মাবধি এই নদী একবাব তাকে এই পারে একবার ঐ পারে নিয়ে কত খেলাই না খেলছে। মাতানিয়া গাঙ, জিরানিয়া নদী এই সোনারঙ থেকে আবার যে কোথায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, অনঙ্গ ভেবে ভেবে ঠিক পায় না।

নদীর মনে কি আছে, কে জানে।

নদী আরো আবছা হয়ে যায়। দূবের বালুচরটা ধূ-ধূ করে। আর জিরানিয়া ঘাটে বসে নিজের জীবনের একটা মোটামুটি হিসাব কষে অনঙ্গ।

সুরূপনগরের ব্রজবাসীর মুখে অনঙ্গ তার নিজের জন্মেব কথা শুনেছে। বাপ-মায়ের কথা মনে নেই তার। মা তাকে জন্ম দিয়েই চোখ বুঁজেছিল। বাপ মরেছিল বছর পুরতে না পুরতেই।

ব্রজবাসীই তাকে মানুষ করেছে। এক হিসাবে ব্রজবাসীই তার মা-বাপ।

মনের মধ্যে কত কথাই না তোলপাড় করে।

মান্দার গাছগুলির তলায় শুকনা পাতার স্তূপ জমে রয়েছে। আচমকা সেখানে খচমচ শব্দ হয়। অনঙ্গ চমকে ওঠে, ঘুরে বসে এদিক সেদিক তাকাতে থাকে। তাকাতে তাকাতে হঠাৎ তার চোখে পড়ে—

চোখ দুটো মাটির দিকে নামানো, কাঁখে রাঙা মাটির কলস, সুঠাম মাজায় বাহারের শাড়ি, গোরা গোরা গায়ের রঙ—শেষ বেলার আবছা আলোতেও মালীর মেয়ে সুবাসীকে চিনে ফেলে অনঙ্গ।

অনঙ্গ উঠে আসে। বলে, 'সুবাসী না?'

চোখ তুলেই নামিয়ে ফেলে সুবাসী। বুকের ভিতরটা উথলপাথল করে। শরীরটা থর থর করে কাঁপতে থাকে।

আরো কাছে এগিয়ে আসে অনঙ্গ। বলে, 'মুখখান যে নামাইয়াই (নামিয়েই) রাখলা! তোল—'

মুখ তো তুলতেই চায় সুবাসী। পারে কই? অনঙ্গর মুখ দেখার জন্য তার প্রাণে কত ইচ্ছা, কত সাধ! সেই ইচ্ছা আর সেই সাধ দিবারাত্রি তাকে অস্থির করে রাখে। কিন্তু ইচ্ছা আর সাধের মানুষটার কাছাকাছি এসে বুকের ভিতরটা এমন কাঁপে কেন? মুখটাই বা তুলতে পারে না কেন সুবাসী? নিজের কাছেই এ প্রশ্নের সদুত্তর পায় না সুবাসী।

অনঙ্গ ডাকে, 'সুবাসী—'

'উঁ—'

অস্ফুট একটা শব্দ করে সুবাসী।

'সন্ধ্যা হইয়া আসে; নিরালা ঘাট। এমুন সময় নদীতে আসছ যে সুবাসী! ডর নাই?'

'না।'

সুবাসীর গলা কাঁপে।

একদৃষ্টে সুবাসীর দিকে তাকিয়ে থাকে অনঙ্গ। মালীর মেয়ে সুবাসীর বড় লজ্জা। মুখখানা সেই যে নামিয়ে রেখেছে, আর তুলছে না।

তিন বছর আগে এই জিরানিয়া ঘাটেই সুবাসীকে প্রথম দেখেছিল অনঙ্গ। সেইদিন কিশোরীর চিকণ কোমরে দশহাতি শাড়ি তিন বেড় দিয়েও বশে থাকত না। সেই দিনও কি লজ্জাই না ছিল সুবাসীর!

তিন বছর আগের সেই লজ্জা সমস্ত সত্তার মধ্যে ধরে সেদিনের কিশোরী সুবাসী আজ যুবতী হয়েছে। মালীর মেয়ের লজ্জা কি বাহারের! দু-চোখ ভরে সেই লজ্জা দেখে অনঙ্গ।

অনঙ্গ বলে, 'ডর বুঝি নাই তোমার?'

ফিসফিস করে সুবাসী বলে, 'না।'

'দেখি কেমুন ডর নাই?'

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসে অনঙ্গ। দু-হাতে সুবাসীর মুখটা তুলে ধরে। অর্ধেক বোঁজা চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে থাকে। সুখে, অবুঝ এক কাঁপুনিতে, ভয়ে এবং আবেগে সুবাসীর সারা দেহ থর থর করতে থাকে।

সুবাসীর মুখেচোখে কি দেখে অনঙ্গই জানে। হঠাৎ যেমন সে সুবাসীকে ধরেছিল, হঠাতই আবার তাকে ছেড়ে দেয়। আস্তে আস্তে, অস্ফুট গলায় বলে, 'অখনও ডর লাগে সুবাসী?'

সুবাসীর কাঁপুনি বুঝি অনঙ্গব গলাতেও ধরেছে।

সুবাসী এবার আর মুখ নামায় না। একদৃষ্টে অনঙ্গকে দেখতে থাকে। অনঙ্গ বুঝি একটিমাত্র স্পর্শে তাব সব লজ্জা, সব ভয় ঘুচিয়ে দিয়েছে।

জীবনে এই প্রথম একা একা অনঙ্গর কাছে এসেছে সুবাসী। তার সঙ্গে কথা বলেছে। সে তাকে ছুঁয়েছে। ইচ্ছা আর সাধের মানুষের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ানোর মধ্যে কত যে সুখ, কত যে আনন্দ! জীবনে এই প্রথম সেই সুখ আর আনন্দের স্বাদ পেল সুবাসী। বিচিত্র এক নেশার মত রক্তের ভিতর ঝিম ঝিম করতে থাকে তার।

অনঙ্গ আবার বলে, 'ডর নি গেছে?'

সুবাসী বলে, 'ডর তো পাই নাই।'

সময় যায়। কাদাখোঁচা পাখিগুলি আর চোখে পড়ে না। ধূ-ধূ বালুচরটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ধলেশ্বরী আবছা হয়ে আসছে। সন্ধ্যা নামে নামে।

সুবাসী তাকিয়েই থাকে। ভেবে সে থই পায় না, তার যে বুকের ভিতরটা লজ্জা আর থরথরানিতে ঠাসা, সেখানে ভর সন্ধ্যায় একটি পুরুষের মুখোমুখি দাঁড়াবার মত তুরন্ত সাহস এল কোথা থেকে ?

অনঙ্গ বলে, 'আমারে কিছু কইবা (বলবে) সুবাসী ?'

'হ।'

'কও।'

'সেদিন কথা দিছিলেন (দিয়েছিলেন) আমাগোর বাড়িত্ যাইবেন। কিন্তুক গেলেন না তো।'

'কোনদিন ?'

'উই যে, সই আর আমি গেছিলাম।'

অনঙ্গ অল্প একটু হাসে। বলে, 'আমি তো কথা দিই নাই। সুজন তালুই দিছিল।'

'অ।'

গাঢ় গলায় অদ্ভুত একটা শব্দ করে চুপ করল সুবাসী।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

নদীতে ভাটির টান। ভাটির টানের মৃদু শব্দটা সন্ধ্যার আবছা আবছা অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। যতদূর তাকানো যায়, একটা নিরন্ত অন্ধকার আকাশ আর নদীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

অনঙ্গ বলে, 'গোসা নি হইছ সুবাসী ?'

'গোসা হমু ক্যান ?'

'তোমাগর বাড়িত্ যাই নাই বইলা (বলে)।'

সুবাসী জবাব দেয় না।

আরো খানিকটা কাছে এগিয়ে আসে অনঙ্গ। ফিসফিস, গাঢ় গলায় বলে, 'বাড়িত্ গিয়া কি করুম। তার থিকা তুমি এই নদীর পারে আইসো (এসো)। কেমুন ?'

অস্ফুট একটা স্বর ফোটে সুবাসীর গলায়, 'আসুম।'

আবার খানিকটা চুপচাপ। ভাটির টানের মৃদু শব্দ ছাড়া

কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। এখন কেউ কথা বলছে না। না সুবাসী, না অনঙ্গ।

হঠাৎ যেন অনঙ্গর মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'একখান কথা সুবাসী—'

'কি কথা?'

'সগল সময় তুমি আর রঙ্গিলা একসাথে থাক। আইজ (আজ) তারে যে দেখি না।'

'সগল সময় সই আমার লগে (সঙ্গে) থাকব, তা কি হয়!' সুবাসীর গলাটা কেমন যেন শোনাতে থাকে, 'তা হয় না, কিছুতেই হয় না।'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাতে থাকে সুবাসী।

দূরে মান্দার গাছগুলির আড়াল থেকে সব দেখছিল রঙ্গিলা। দেখতে দেখতে তার চোখ জোড়া ধক ধক করছিল।

সুবাসী অনঙ্গর কাছে যাবার আগে একটু ঘটনা আছে।

দুই সই, রঙ্গিলা আর সুবাসী, কাঁখে মাটির কলসী নিয়ে জিরানিয়া ঘাটে এসেছিল। এসেই তাদের চোখে পড়েছিল, মান্দার গাছগুলির নিচে অনঙ্গ বসে রয়েছে।

অনঙ্গকে দেখিয়ে রঙ্গিলা বলেছিল, 'সই, উই দ্যাখ্—'

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে সুবাসী বলেছিল, 'তুই-ই দ্যাখ্—'

'দ্যাখনের সাধ তো ষোল আনা। আবার সরমও আছে, হায় ভগমান, তোরে নিয়া যে আমি কী করুম?'

সুবাসীর থুত্‌নিটা ধরে অনঙ্গর দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল রঙ্গিলা। বলেছিল, 'দ্যাখ্ দ্যাখ্, সাধ মিটাইয়া মনের মানুষেরে দ্যাখ্—'

সুবাসী অনঙ্গব দিকে তাকায় নি। চোখ নামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল।

একটু চুপচাপ।

একসময় রঙ্গিলাই আবার শুরু করেছিল, 'যা সই, অনঙ্গর কাছে যা।'

অস্ফুট গলায় কি যেন বলেছিল সুবাসী।

'যা-যা, আব দেরি কবিস না। সন্ধ্যা হইয়া আইল।'

'আমাব বড় শবম লাগে সই।'

'শরম!'

বঙ্গিলা বলেছিল, 'অত যদি সবম, তা হইলে মনেব মানুষেরে পাবি কেমনে!'

একটু থেমে আবাব বলে, 'এই সুযুগ ছাড়িস না সই। আমি এই মান্দাব গাছেব আবডালে খাড়ই (দাঁড়াই)। তুই অলঙ্গর কাছে যা। গিয়া মনেব কথা ক' (বল)।'

প্রথমে যেতে চায় নি সুবাসী। বঙ্গিলাই তাকে ঠেলেঠুলে অনঙ্গর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

॥ পনের ॥

একটু আগে সন্ধ্যা হয়েছে।

এতক্ষণ আকাশ আব নদীটাকে আবছা দেখা যাচ্ছিল। দূরের বালুচরটা ধূ-ধূ কবছিল। এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আকাশ-নদী-বালুচব—এখন সমস্ত কিছু গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত।

নদীতে এখন মাতন লেগেছে। তুই তীব দু পাশাপাশি করে ঢল নেমেছে। এখন জোয়ার। আবেগে নদী দ্রুতবহ, উত্তেজিত, অস্থির।

উত্তব থেকে হু-হু বাতাস ছুটে এসেছে। পাক খেয়ে খেয়ে সেই বাতাস দক্ষিণে চলেছে।

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে।

সুবাসী আর অনঙ্গকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবু বোঝা যায়, তুজনে বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মান্দার গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রঙ্গিলা। তাব চোখ তুটো জ্বলছে। বুকের ভিতবে কোথায় যেন, অবুঝ এক কাঁপুনি ধরেছে

অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে রঙ্গিলার চোখ তুটো অনঙ্গদের দিকে তাকিয়ে আছে।

এ কি হল? বুকেব ভিতর এই কাঁপুনি কেন? কেন চোখ তুটো জ্বলছে? নিজের মনকেই শুধলো রঙ্গিলা।

তবে কি এরই নাম ঈর্ষা? এরই নাম হিংসা?

একদিন এই ধলেশ্বরীকে সাক্ষী রেখে রঙ্গিলা কথা দিয়েছিল, যেমন করে হোক, সুবাসীকে সে পরবাসী গোরাচাঁদ পাইয়ে দেবে।

কিন্তু এ কি হল?

কোনদিন অনঙ্গর বুকের কাছে এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায় নি সুবাসী। রঙ্গিলাই তাকে বার বার অনঙ্গর কাছে যেতে বলেছে। মনের ভিতর যে গোপন সাধটা রয়েছে, তার কথা বলতে বলেছে।

মনের কথা খুলে না বললে অনঙ্গ বুঝবেই বা কেমন করে?

আজ একরকম ঠেলেঠুলেই সুবাসীকে অনঙ্গর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে রঙ্গিলা। কিন্তু অনঙ্গর সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখে প্রাণের ভিতরটা এমন করে ওঠে কেন?

একদৃষ্টে সুবাসীদের দিকে তাকিয়ে আছে রঙ্গিলা। হঠাৎ তার মনে হল, সুবাসীটা বড় বেহায়া, বড় নির্লজ্জ। মুখে মুখেই সে শুধু শরমের কথা বলে। রঙ্গিলা যে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, এতটুকু খেয়াল নেই। অনঙ্গর বুকের ভিতর কেমন বেহুঁশ হয়ে সে ঢলে পড়েছে!

রঙ্গিলা ভাবল, লজ্জার মাথা এমন করেও মানুষে খায়! কি জানি কেন, সুবাসীর উপর, অনঙ্গর উপর, পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপর এই মুহূর্তে হঠাৎ ক্ষেপে উঠল সে।

এর নামই কি হিংসা? এর নামই কি ঈর্ষা?

হয়ত তাই।

ঢালীর মেয়ে রঙ্গিলা নিজের মনের রীতি বোঝে না। হঠাৎ গলায় বিষ ঢেলে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'সই—'

মান্দার গাছের তলায় দুটো ঘনিষ্ঠ মূর্তি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

সুবাসী বলে, 'আমারে ডাকলি?'

'হ।' রঙ্গিলার গলাটা বড় কর্কশ, বড় রুক্ষ শোনায়. 'এদিকে আয়।'

সুবাসী এগিয়ে আসে। বলে, 'কী হইল সই ?'

'কি আবার হইব ?'

অদ্ভুত একটু হাসে রঙ্গিলা। বলে, 'খুব যে মইজ্জা (মজে) আছিলি ! কোনদিকে হুঁশ নাই।'

সুবাসী বলে, 'মনের মানুষেরে, মনের কথা কইতে আছিলাম।'

নীরস গলায় রঙ্গিলা বলে, 'হৌক মনেব মানুষ, পুরুষ মানুষ তো। পুরুষ মানুষেব কাছে এমুন কইবা লাজ-শরমেব মাথা খাইতে হয় ! নিলাজ, ডাকাবুকা মাইয়া !'

সুবাসী অবাক হয়ে যায়।

খানিকটা চুপচাপ।

বিস্ময়ের ঘোর কাটলে সুবাসী বলল, 'তোর কি হইছে সই।'

'কিছুই হয় নাই।'

'তবে এমুন করতে আছিস ক্যান ?'

এবাব জবাব দিল না রঙ্গিলা। জোবে জোবে পা চালিয়ে শূন্য মাঠটার উপর দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল।

সুবাসী বলল, 'আমারে নিয়া যা সই।'

পিছন ফিরে আর তাকাল না রঙ্গিলা।

এতদিন নিজেকে বুঝতে পাবে নি রঙ্গিলা। আজ সুবাসীকে অনঙ্গর বুকের কাছে ঘন হতে দেখে সে চমকে উঠেছে।

তার প্রাণের গভীরে তারই অজান্তে সুন্দব এক সাধেব জন্ম হয়েছিল। আশ্চর্য ! সেই সাধটা অনঙ্গকে ঘিরে বিভোর হয়ে ছিল। এতকাল তা বুঝতে পারে নি রঙ্গিলা। কিন্তু এই মাত্র বুঝেছে। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সুবাসীকে সে আর সহ্য করতে পারছে না।

একসময় বাড়ীর কাছে এসে পড়ল রঙ্গিলা।

চারপাশে ঘন অন্ধকার। এখন মাথার উপর একটি দুটি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

॥ ষোল ॥

সুন্দর মালীর উঠানে সামিয়ানা টাঙিয়ে গীতবাদ্যের আসর বসেছে। চারপাশে চারটে হ্যারিকেন জ্বলছে। তাতে যে আলো হয়, অন্ধকার দূর করার পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়।

আলো আর অন্ধকারে আসরটা কেমন যেন রহস্যময় হয়ে আছে।

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। আজ কি তিথি কে জানে। চাঁদ ওঠে নি। অজস্র তারা ফুটেছে।

আকাশটা যেন একটা কালো, জামদানী শাড়ি। তারাগুলো তার গায়ে রুপোর বুটি।

ঢালী পাড়া, মালী পাড়া, কুমার পাড়া—সমস্ত গ্রামটা উজাড় হয়ে মানুষ এসেছে। আসরটা জমজমাট।

শুধু যে গান-বাজনার টানেই মানুষগুলো এসেছে, তা নয়। সুন্দর মালী পাকা মিঠাইর বন্দোবস্ত করেছে। আসল টানটা তারই।

সুন্দর মালীর গলাখানা ভারি মিঠে। বাঁ হাত কানে ঠেকিয়ে ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে রসের গান ধরেছে সে—

নদীর ঘাটে দেখাশুনা,
কাক্ষেতে কলসী
ঐছন করিয়া গেছে
তোমার মোহন বাঁশী,
রে বন্ধু,
তোমার মোহন বাঁশী।

তালের মাথায় সুব ছেড়ে দিয়ে আসরটা দেখে নেয় সুন্দর। চারপাশের মানুষগুলো মুগ্ধ হয়ে তার গান শুনছে।

উৎসাহে মেতে ওঠে সুন্দর। চোখ দুটো তাব চকচক করে। এক সময় আবার সে সুর ধরে—

ঘরের বাহির হইতে নারি,
কুলমানের ভয়।
পিঞ্জরা ছাড়িয়া মন,
বাতাসে উড়য়।

বে বন্দু,
বাতাসে উড়য়।

সুরটা কখনও খাদে নামায়। কখনও চড়ায়। সুন্দরেব গলায় গমক খেলতে থাকে।

আসরটা যখন পুবাপুরি জমে উঠেছে, ঠিক সেই সময় চন্দ্র মালী এল। বলল, 'তোমরা সগলে আস গো। নদীব ঐ পাব থিকা সুবাসীরে দেখতে আসছে।'

বুড়ো কুঞ্জ মালী আসবেব মাঝখানে বসে ছিল। এতক্ষণ মাথা নেড়ে নেড়ে সুন্দরের গানের তারিফ করছিল। কখনও বা শুকনো হাঁটুতে আঙুল দিয়ে তাল ঠুকছিল।

বুড়ো কুঞ্জ সুবাদে চন্দ্রর জেঠা। চন্দ্র ঢালীর মেয়ে বিয়ে কবে জাতি দিয়েছে। সেই থেকে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই কুঞ্জর। এমন কি কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ। কুঞ্জর বাড়িতে কোন কাজকর্ম হলে মালীপাড়ার সবাই আসে। কিন্তু চন্দ্রকে সে ডাকে না।

চন্দ্র মালী কুঞ্জর কাছে এসে দাঁড়াল। তার দু-খানা হাত ধরে করুণ গলায় বলল, 'চল জেঠা—'

'তোর মাইয়ারে (মেয়েকে) দেখতে আসছে ; তা আমি যামু ক্যান? ধরমনাশা জাতিনাশার লগে (সঙ্গে) আমার কুনো সম্পক্ক নাই।'

'চল জেঠা, চল।'

চন্দ্র মালী বলতে থাকে, 'তুমি হইলা মালী সোমাজের মাথা। তুমি না গেলে কি চলে ?'

'মালী সোমাজের মাথা !'

বুড়ো কুঞ্জ খেঁকিয়ে ওঠে, 'রাখছিলি আমার কথা ? নীচ জাতি ঢালীর মাইয়া তো বিয়া করলি—'

'উই সগল কথা অখন থাউক জেঠা। আমি তোমার পায়ে ধরি—তুমি চল।'

একটু সময় কি যেন ভাবল বুড়ো কুঞ্জ। তারপর আসরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল গো মাত্‌বরেরা (মাতব্বরেরা), চল। সুবাসীরে দেখতে আসছে। দেখি চন্দর কেমুন সম্বন্ধ আনছে—'

কথার বাকী অংশটা পূরণ না করেই হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল কুঞ্জ। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই উঠল।

ভরা আসরটা এমন করে ভেঙে যাওয়ায় বিষণ্ণ মুখে বসে রইল সুন্দর মালী।

বাজিতপুর থেকে সেই বুড়ো মালী সুবাসীকে দেখতে এসেছে। সঙ্গে এসেছে মুকুন্দ, লখাইচাদ এব আরো পাঁচ-সাতজন।

একখানা পাটি বিছিয়ে খাতির করে তাদের বসিয়ে কুঞ্জদের ডাকতে গিয়েছিল চন্দ্র মালী। ছিলিমের পর ছিলিম সুগন্ধি তামাক পুড়ছে। মাঝখানে হ্যারিকেন জ্বলছে।

এক সময় কুঞ্জ মালীদের নিয়ে চন্দ্র ফিরে এল।

চন্দ্র বলল, 'এই যে বুড়া মালী, এনি (ইনি) আমার জেঠা।' কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এনারা বাজিতপুরে নয়া বসত করছে। সেইদিন এনাগো গেরামে গেছিলাম। সম্বন্ধের কথা কইয়া আসছি। আইজ মাইয়া দেখতে আসছে।'

'ভাল, ভাল —'

কুঞ্জ বলতে লাগল, 'আইসা বড় আনন্দ দিলেন আপনেরা।'

বুড়ো মালী বলল, 'আমরাও আনন্দ পাইছি।'

কুঞ্জ বলল, 'সুবাসী হইল আমার নাতনি। তা নাতিন-জামাই আসছে না কি?'

বুড়ো মালী মুকুন্দকে দেখিয়ে বলল, 'হ, এই যে। এই সেই কালাচাঁদ।'

মুকুন্দ মুখ নিচু করে বসেছিল।

কুঞ্জ বলল, 'বাঃ বাঃ, দেখি, নাতিন জামাইর মুখ দেখি।'

মুকুন্দ মুখ তোলে না।

কুঞ্জ আবার বলে, 'পুরুষ মানুষ না তুমি? কি গো শালা? শরমে দেখি মাইয়া মানুষের লাখান (মত) রাঙ্গা হইয়া গেলা।'

বলতে বলতে নিজেই মুকুন্দর মুখটা তুলে ধরল কুঞ্জ। বলল, 'সোন্দর! সুবাসীর পাশে যা মানাইব!'

একটু চুপচাপ।

কুঞ্জই আবার শুরু করল, 'কিন্তুক ভাই কালাচাঁদ, তুমি যে আমার মনটা খারাপ কইরা দিলা।'

'ক্যান?' অস্ফুট গলায় মুকুন্দ বলল।

'ভাবছিলাম সুবাসীরে তোমার ঠাকুরমার সতীন কইরা নিমু। কিন্তুক তুমি শালা তারে তো কাইড়া নিতে আসছ।'

কুঞ্জর কথায় সবাই হেসে উঠল।

তামাক পুড়তে থাকে। কথায় কথায় নানা প্রসঙ্গ ওঠে। ঠাট্টা-ঠিসারার কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, দেশকালের কথা, জমি-জমা, ঘরবসতের কথা। কথার শেষ নেই। কথার স্বভাব লতার মত। আশ্রয় পেলেই বাড়তে থাকে।

শেষ পর্যন্ত কথা আসল প্রসঙ্গে এল। মুকুন্দর সঙ্গে সুবাসীর বিয়ের প্রসঙ্গ।

অনেকটা রাত হয়েছে।

বাজিতপুরের বুড়ো মালী বলল, 'এইবার মাইয়া (মেয়ে) দেখাও গো মালীর পুত। অনেক রাইত হইল। আমাগো আবার নদীর উই পার যাইতে হইব।'

'নিচ্চয়—নিচ্চয়—'

চন্দ্র ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কিন্তুক তার আগে একখান কথা আছে।'

'কী কথা?'

'এই যে—'

বলতে বলতে ঘরে ঢুকল চন্দ্র মালী। এর পর অনেকগুলো বেতের সাজি নিয়ে বেরিয়ে এল। সাজিগুলো চিঁড়ে-মুড়ি, সবরি কলা আর খইয়েব মোয়া দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো।

প্রত্যেকের সামনে একটা করে সাজি রাখল চন্দ্র।

'এই কথা!'

বাজিতপুরের বুড়ো মালী বলল, 'এ তো ভাল কথা।'

বলেই সব।র কলায় কামড় বসাল।

সবার খাওয়া চুকলে সুবাসীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আসরের মাঝখানে এনে বসাল চন্দ্র মালী। দুই হাত জোড়া করে বলল, 'এই আমার মাইয়া সুবাসী।'

মুখ নিচু করে বসে আছে সুবাসী। সারা দেহ থর থর করছে। চোখ ফেটে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে। অবুঝ, অবোধ এক দুঃখ বুকের মধ্যে পাক খাচ্ছে।

বাজিতপুরের অচেনা মানুষগুলো, হ্যারিকেনের আলো, কুঞ্জ মালী, চন্দ্র মালী—কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না সুবাসী। বার বার অনঙ্গর মুখখানা মনে পড়ছে। প্রথম যৌবনের পিরীত কি এমন করেই ভেঙে যায়! সুবাসী যত ভাবে, বুকের ভিতর কোথায় যেন মোচড় লাগে।

বুড়ো মালী বলল, 'বাঃ বাঃ! কি দেখলাম একি, রাধারূপের ঝিকিমিকি। গোলোকের লক্ষ্মী পিরথিমীতে নাইমা আসছে যে গো। আমাগোর কালাচাঁদের পাশে মানাইব ভাল।'

মুগ্ধ চোখে সুবাসীকে দেখছিল মুকুন্দ। তাকে একটা ঠেলা মেরে বুড়ো মালী বলল, 'অত দেখিস না মুকুন্দ, চোখে ধাঁধা লাগব।'

আসরের সবাই হেসে উঠল। লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল মুকুন্দ।

বুড়ো মালী সুবাসীকে বলল, 'যাও দিদি, ঘরে যাও।'

পা দুটো টলছে। থরথর শরীরটাকে টানতে টানতে ঘরে ঢুকল সুবাসী।

চন্দ্র মালী বলল, 'মাইয়া কেমুন দেখলেন বুড়া মালী?'

'সোন্দর।'

বুড়ো মালী বলল, 'এটা হইল ফাল্গুন মাস। এই মাসে এট্টু অসুবিধা আছে। এর পরে চত্তির মাস। চত্তির মাস বিয়া হইব না। বৈশাখ মাসেই দিদিরে আমার ঘরে নিয়া যামু।'

মুকুন্দর দিকে তাকিয়ে শুধলো, 'কি রে, তোর মত আছে তো মুকুন্দ?'

অস্ফুট গলায় মুকুন্দ কি বলল, বোঝা গেল না।

হঠাৎ আসরের মধ্যে থেকে উঠে দাড়াল কুঞ্জ মালী। বলল, 'আমার একখান কথা আছে।'

'কি কথা?'

জিজ্ঞাসু চোখে বুড়ো মালী কুঞ্জর দিকে তাকাল।

কুঞ্জ শুরু করল, 'লাখ কথা না হইলে বিয়া হয় না। কিন্তুক আমার হইল মাত্তর একখান কথা। বিয়ার ব্যাপার। এ হইল সারা জীবনের সম্বন্ধ। দুই চার দিনের খেলা না। তাই আগে তিতা পরে মিঠা হওয়াই ভাল। আপনেরা কী ক'ন (বলেন)?'

'নিশ্চয় নিশ্চয় -'

বাজিতপুরের বুড়ো মালী মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয়।

'শোনেন সগলে—

কুঞ্জর মুখেচোখে একরোখা নির্মম ভঙ্গি ফুটে বেরোয়। সে বলতে থাকে, 'এই যে চন্দর, আমার ভাইর বেটা, মালী হইয়া সে ঢালীর মাইয়া বিয়া করছে। নিজের জাতিনাশ করছে। জ্ঞাতি-গুষ্ঠীর মুখে কালি দিছে। সেই বিয়ার ফল হইল এই মাইয়া—এই সুবাসী। সত্য কথাটা কইলাম। এর পর যদি সুবাসীরে নিজের নাতির লগে (সঙ্গে) বিয়া দিতে চান, সেটা আপনের ইচ্ছা।'

আসরের মাঝখানে একটা বাজ পড়ল যেন।

চন্দ্র মালী একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে। নড়াচড়ার শক্তিই সে হারিয়ে ফেলেছে। জ্ঞাতি যে এমন নির্দয়, নিষ্ঠুর হতে পারে, এতবড় একটা প্রমাণ হাতে-নাতে পেয়েও পুরাপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না সে।

কি যেন বলতে চেষ্টা করল চন্দ্র মালী। কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না।

আশ্চর্য!

সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাজিতপুরের বুড়ো মালী বলল, 'জাত-গোত আমি মানি না। সুবাসীরে আমার পছন্দ হইছে। ওরেই আমার নাতির বউ করুম।'

'ও, আচ্ছা। আপনেরা সগলে তা হইলে এক দলের দলী। জাতিনাশা, ধরমনাশার দল—'

গজর গজর করতে করতে চলে গেল কুঞ্জ মালী। যারা জাতি মানে না, সমাজ মানে না, সেই সব মানুষের সঙ্গে কোন সংস্রব, কোন সম্পর্কই সে রাখবে না।

॥ সতের ॥

দিন দুই আগে স্বরূপনগর গিয়েছিল সুজন মাঝি। সেখান থেকে বিরস মন নিয়ে ফিরে এসেছে সে।

স্বরূপনগরের ব্রজবাসী বলেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই একবার সে এখানে আসবে। অনেক দিন অনঙ্গকে দেখে নি। অনঙ্গকে দেখার ইচ্ছা হয়েছে তার।

শিশুকাল থেকে অনঙ্গকে মানুষ করেছে ব্রজবাসী। বিষয়বিমুখ বিবাগী মানুষ সে। কোন ব্যাপারেই তার মোহ নেই, আসক্তি নেই। তবু এই নির্মোহ, নিরাসক্ত মানুষটির মনে অনঙ্গ সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে। অনঙ্গর উপর কেমন যেন মায়া বসে গিয়েছে।

রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। তবু তারই হাতে অনঙ্গ মানুষ হয়েছে। তারই চোখের সামনে বড় হয়ে উঠেছে।

মায়া কাটাবার জন্য অনঙ্গকে সুজন মাঝির হাতে দিয়েছিল ব্রজবাসী। তিন বছর সুজন মাঝির কাছে আছে অনঙ্গ। তিন বছর চোখের আড়ালে রেখেও তার উপর থেকে ব্রজবাসীর মায়া গেল না।

জীবনের গূঢ় তত্ত্বগুলি গভীর ভাবে বোঝে ব্রজবাসী। সে জানে, বেশি জড়াতে নেই। যতই জড়াবে ততই দুঃখ। পৃথিবীর উপর আলগোছে ভেসে থাকো। মায়া-মোহ-আসক্তি—জীবন থেকে এই উপসর্গগুলিকে যত পার ছাঁটাই করে ফেল। এত বুঝেও এত জেনেও মাঝে মাঝে অবুঝ হয়ে ওঠে ব্রজবাসী। ইদানীং অনঙ্গকে দেখার জন্য

মনটা তার আকুল হয়ে উঠেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সে সোনারঙ আসবে।

ব্রজবাসীর মনে কি আছে, সুজন মাঝি জানে না। বার বার সেই শর্তটার কথা মনে পড়ে। যখনই ব্রজবাসী চাইবে, অনঙ্গকে দিতে হবে। ভাবতে ভাবতে বুকটা তার কাঁপে। সব সময় তার চিন্তা, এই বুঝি অনঙ্গকে হারায়।

সুজন মাঝির ছেলেপুলে নেই। অনঙ্গকে পেয়ে তিনটে বছর সন্তানের দুঃখ ভুলে আছে সে। অনঙ্গ তার আর তার মাঝিনীর দুই চোখের মণি। এই বুড়ো বয়সে অনঙ্গকে হারাবার দুঃখ তারা সইতে পারবে না।

মনটা বিষণ্ণ হলে সুজন মাঝি যে গানটা গায়, সেইটাই এখন গাইছে।

তোর ভাবনা ভেবে মরি,
ধৈয্য হতে নাহি পারি,
আমি কি করিতে কি যে করি,
ভাবি নিশি দিনে রে—
ভাবনার হল বিদ্ধি,
কি করিবে মহাবধি,
ভাবনারোগে নাই রে বিধি,

বারান্দায় বসে উদাস, ব্যাকুল স্বরে গাইছিল সুজন মাঝি। চোখ থেকে অবিরাম জল ঝরছিল।

অনঙ্গ কোথায় যেন গিয়েছিল। এইমাত্র সে ফিরে এল।

বারান্দা থেকে নেমে ছুটে এল সুজন মাঝি। দুই হাতে অনঙ্গকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দুই চার'দিনের ভিতর ব্রজবাসী আসব। কি জন্যে আসব, তুই কিছু জানস অনঙ্গ ?'

'না।'

'আমার মনে কু-ডাক উঠছে। ব্রজবাসী বুঝি আমার বুক থিকা তোরে ছিনাইয়া নিয়া যাইব।'

অনঙ্গ কিছু বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

দু-হাতে অনঙ্গর মুখটা তুলে ধরে সুজন মাঝি বলে, 'আমারে ছাইড়া যাইস না অনঙ্গ। এই বয়সে তোরে হারাইলে আমি বাঁচুম না।'

অনঙ্গকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সুজন মাঝি আকুল হয়ে ওঠে। কেঁদে কেঁদে বলে, 'এই বয়সে ব্যথা দিস না অনঙ্গ।'

অনঙ্গ উত্তর দেয় না। সুজন মাঝির বুকের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে সে। কি উত্তর সে দেবে? উত্তর দেবার মত একটা কথাও যে খুঁজে পাচ্ছে না।

॥ আঠার

একদিন ঢালীর মেয়ে রঙ্গিলারও সম্বন্ধ হয়ে গেল।

রঙ্গিলার বাপের নাম নয়ন ঢালী। দিন তিনেক আগে নয়ন ভাসান চরে গিয়েছিল। সেখানে এক ঢালীর ঘরে রঙ্গিলার সম্বন্ধ ঠিক করে এসেছে।

ঢালীর ঘরে মেয়ের বিয়ের রীতি অন্য। সেখানে মেয়ের বাপ পণ পায়। রঙ্গিলার সম্বন্ধ ঠিক করে পণ হিসেবে দু-কুড়ি টাকা আগাম নিয়ে এসেছে নয়ন ঢালী।

ভাসান চর থেকে ফিরেই নয়ন ঢালী সম্বন্ধের কথাটা সোনারঙ গ্রামের সবাইকে বলেছে। আনন্দে সবাইকে নিজের বাড়ি ডেকে এনে পান-তামাক আর মিষ্টি খাইয়েছে।

সম্বন্ধের কথাটা রঙ্গিলাও শুনেছে।

সম্বন্ধ ঠিক করার পর তিনটে দিন পার হয়েছে। এই তিনটে দিন রঙ্গিলার বুকের ভিতরটা কেমন যেন খা-খা করছে। বাপ ভাসান চরে কোন এক অচেনা পুরুষের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে এসেছে। তাকে সে দেখে নি, জানে নি। অথচ তারই সঙ্গে বাকি জীবন ঘর করতে হবে। তার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনটাকে গাঁথতে হবে। কিছুতেই রঙ্গিলার মন সায় দিচ্ছে না। অবুঝ এক দুঃখে বুকের ভিতরটা টন টন করছে।

যে পুরুষকে সে জেনেছে, দেখেছে, যার চোখের সামনে কিশোরী থেকে সে যুবতী হয়ে উঠেছে, সেই অনঙ্গকে পাবে সুবাসী ; সারা জীবন তাকে ভোগ করবে। (সুবাসীর সম্বন্ধও যে ঠিক হয়েছে, সে কথা জানে না রঙ্গিলা)। সেদিন সন্ধ্যায়, ধলেশ্বরীর পারে, অনঙ্গর কাছে নিজেব মনের কথা বলতে গিয়েছিল সুবাসী। রঙ্গিলাই তাকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অনঙ্গর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সুবাসীকে কথা বলতে দেখে বুকেব ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল রঙ্গিলার। ঈর্ষায় প্রাণটা খাক হয়ে যাচ্ছিল। সেদিন থেকে তুই সইয়ের মধ্যে বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে না।

সুবাসী অনঙ্গকে পাবে। না-না, মন কিছুতেই বুঝ মানছে না। সুবাসী তার সই। একদিন ধলেশ্বরী সাক্ষী বেখে তাকে সে কথা দিয়েছিল, যেমন করেই হোক, সুবাসীর হাতে অনঙ্গকে দেবে। সে কথা রঙ্গিলা ভোলে নি। তবু তার মন অবুঝ হয়ে উঠেছে।

কৈশোব থেকে যৌবন—এই সন্ধিকালের মধ্যে একটি মাত্র পুরুষকেই দেখেছে রঙ্গিলা। সেই পুরুষ অনঙ্গ। অনঙ্গব সঙ্গে ছলা-কলা আর রঙ্গঠমকের কত খেলাই না খেলেছে। সুবাসীর হয়ে অনঙ্গকে কত কথাই না বলেছে। সমস্ত কথা আব খেলার তলায় কখন যে একটি সুন্দর সাধ সঙ্গোপনে জন্ম নিয়েছে, এতকাল রঙ্গিলা বুঝতে পারে নি। সেদিন আবছা সন্ধ্যায় মান্দাব গাছগুলির তলায় সুবাসী যখন অনঙ্গর বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন সেই সাধটার কথা প্রথম সে জেনেছে।

সেই সাধটা কী ? নিজের মনকেই অনেকবার শুধিয়েছে রঙ্গিলা। উত্তরও পেয়েছে। সেই সাধটা হল, অনঙ্গকে পাওয়ার সাধ।

বারান্দার এক কোণে একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে আছে রঙ্গিলা। সামনে ফসলহীন, শূন্য মাঠে বাওড়-ঘূর্ণি পাক খাচ্ছে।

হু-হু বাতাস ছুটছে। ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে রঙ্গিলার চোখদুটো ধিকিধিকি জ্বলে। অবুঝ মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে। শুকনো মাটিতে চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যাচ্ছে।

এর নামই কি পিরীত? বুকের মধ্যে এই যে এত ব্যথা, এর নামই কি পুরুষ সাধ?

নিঃস্ব মাঠটার দিকে তাকিয়ে রঙ্গিলার মনে হল, আজই, এই মুহূর্তে অনঙ্গর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

হঠাৎ উঠে পড়ল রঙ্গিলা। ছুটতে ছুটতে প্রথমে ধলেশ্বরীর পারে এল। কিন্তু অনঙ্গকে পাওয়া গেল না। সেখান থেকে সুজন মাঝির বাড়ি গেল সে। সেখানেও অনঙ্গ নেই। এবার মালীপাড়ার দিকে রওনা হল রঙ্গিলা।

উজানিয়া খালের সাঁকোর কাছে অনঙ্গকে পাওয়া গেল।

রঙ্গিলা বলল, 'গেছিলা কোথায়? সারা গেরাম তোমারে খুঁজতে আছি।'

'ক্যান?'

আকুল গলায় রঙ্গিলা বলতে লাগল, 'আমার সব্বোনাশ হইছে অনঙ্গ, সব্বোনাশ হইছে।'

রঙ্গিলার স্বরে এমন কিছু রয়েছে, যাতে অনঙ্গ চমকে উঠল। ঠমকে-ঠমকে, ঠাট্টায়-তামাসায় যে যুবতী সব সময় মাতোয়ারা, যার চোখে কথায় কথায় ঝিলিক খেলে, সেই রঙ্গিলাকে এখন কেমন যেন দেখায়। রুখু রুখু উড়ু উড়ু চুল, গালে লোনা জলের শুকনো দাগ, কাপড়চোপড় আলুথালু। রঙ্গিণী যুবতীকে আজ আর চেনাই যাচ্ছে না।

অনঙ্গ বলে, 'কী হইছে ঢালীর ঝি?'

'কমু, সগল কমু। তোমার লগে (সঙ্গে) আমার অনেক কথা আছে।'

'কি কথা?'

'বাপ আমার সম্বন্ধ কইরা ফেলছে। কিন্তুক সে বিয়া আমি করুম না।'

'ক্যান?'

জিজ্ঞাসু চোখে রঙ্গিলার মুখের দিকে তাকায় অনঙ্গ।

চারপাশ নির্জন। হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল রঙ্গিলা। অনঙ্গর দুই হাত ধরে বলল, 'ছাখ পুরুষ, আমার শরম-ভরম নাই। সিধা কথা সিধা কইরাই কই। তুমি আমারে বাঁচাও।'

'কেমনে তোমারে বাঁচামু?'

'আমারে তুমি নাও।'

'তোমারে নিমু!'

অনঙ্গর গলাটা চমকে উঠল।

'হু-হু, আমারে নাও।'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রঙ্গিলা। কান্নার আবেগে তার সুঠাম দেহটা থরথর করতে লাগল।

খানিকটা চুপচাপ

একসময় অনঙ্গ বলল, 'ঢালীর ঝি, কোনদিন তো নিজের কথা কও নাই। সুবাসার কথাই তো কইছ।'

'সুবাসীর কথার ভিতরেই আমার কথা ছিল। তুমি বোঝ নাই পুরুষ?'

অস্ফুট গলায় অনঙ্গ কি বলল, বোঝা গেল না।

রঙ্গিলা আবার শুধলো, 'এতকাল অন্যের কথা তোমারে কইছি। অন্যের কথার মধ্যে নিজের কথাও যে মিশাইয়া দিছি। আইজ নিজের কথা কইতে আসছি। বলতে বলতে রঙ্গিলার গলাটা ধরে আসে।

অনঙ্গ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

রঙ্গিলা বলতে লাগল, 'আমরা মাইয়া মানুষ। চিরকাল মনের কথা লুকাইয়া রাখতে শিখছি। ইসারায় ঠিসারায় মন আমরা খুলি। পুরুষ হইয়া তা যদি না বোঝো অনঙ্গ—'

কথা আর শেষ করল না রঙ্গিলা।

বেলা বাড়ছে। উজানিয়া খালের মৃদু স্রোতে কচুরিপানা দুলছে। রঙ্গিলা বলল, 'অখন যাই অলঙ্গ। কে কোথা থিকা দেইখা ফেলব। বিকালে নদীর পারে আইসো। অনেক কথা আছে।'

'আইচ্ছা।' মাথা হেলিয়ে অনঙ্গ বলল।

দু-জনে দু-দিকে চলে গেল।

যেতে যেতে অনঙ্গ ভাবে, সুবাসী রঙ্গিলা দুই যুবতীই তার মনে রঙ ধরিয়েছে। সুবাসীর লজ্জা তার মিঠে লাগে। আবার ঢালীর মেয়ে রঙ্গিলার ঠাট্টা-তামাসা-কৌতুক তার ভাল লাগে।

কাকে বেশি ভাল লাগে? সুবাসী না রঙ্গিলাকে? নিজেকে হাজার বার শুধিয়েও ঠিকমত জবাব পেল না অনঙ্গ।

চলতে চলতে রঙ্গিলা ভাবে, অনঙ্গকে নিয়ে ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে সে চলে যাবে। বাপ ভাসান চরে বিয়ের সম্বন্ধ করেছে। সে বিয়ে কিছুতেই সে করবে না।

সুবাসীর সাধের মানুষকে সে কেড়ে নিতে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য মনের ভিতর কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ খচ করে। কাঁটাটা অস্বস্তির। কিন্তু অস্বস্তিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

রঙ্গিলা ভাবল, মনের মানুষকে ছিনিয়ে না নিলে কি পাওয়া যায়। কেড়ে নিয়ে ভোগ করাই তো জীবনের রীতি।

॥ উনিশ ॥

বিকালে কিন্তু রঙ্গিলা ধরা পড়ে গেল।

সুবাসী নদীর ঘাটে এসেছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, মান্দার গাছগুলির তলায় অনঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখোমুখি রঙ্গিলা।

ধলেশ্বরী তির তির করে বয়ে চলেছে।

আর খানিকটা পরেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। পশ্চিম আকাশটা কেমন যেন আবছা হয়ে যাচ্ছে।

নদীতে এখন জোয়ার। পারের বিন্নাবন জলের তলায় চলে গিয়েছে। কাদাখোঁচা পাখিগুলি নরম মাটিতে ঠোঁট খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কি যেন খুঁজছে।

সুবাসীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। এই নির্জন নদীতীরে রঙ্গিলা কেন অনঙ্গর কাছে এসেছে?

রঙ্গিলার মনে কি আছে, কে জানে।

আস্তে আস্তে একটা মান্দার গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল সুবাসী। এখান থেকে রঙ্গিলা আর অনঙ্গর কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

আশ্চর্য! একদিন দূর থেকে রঙ্গিলা তার আর অনঙ্গর কথা শুনেছে। আজ সে অনঙ্গ আর রঙ্গিলার কথা শুনছে।

রঙ্গিলা বলছে, 'অনঙ্গ, যেইদিকে তোমার দুই চৌখ যায়, আমারে নিয়া চল। বাপে সম্বন্ধ ঠিক করছে। অচিন পুরুষের হাতে নিজেরে তুইলা (তুলে) দিতে পারুম না। কিছুতেই পারুম না।'

'কোথায় নিমু তোমারে ?'

'আমি কি জানি ! যেইখানে তোমার খুশি, নিয়া চল ।'

'কোথায় যামু ! জন্মের পর সুরূপনগরের হরিসভায় মানুষ হইছি। তারপর তোমাগো এই সোনারঙ গেরামে আসছি। সোনারঙ আর সুরূপনগর ছাড়া এত বড় পিরথিমীতে আর কিছু যে চিনি না ।'

'তুমি না পুরুষ মানুষ ! এমুন কথা কইতে তোমার মুখে বাধল না ! পুরুষ মানুষ যখন যে জায়গায় যায়, সেই জায়গাই তার বশ হয় ।'

একটুক্ষণ কি যেন ভাবে অনঙ্গ। তারপর ফিস ফিস গলায় বলে, 'কিন্তুক সুবাসী ? সুবাসীর কী হইব ?'

'সুবাসী ! সুবাসী ! সুবাসী !'

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে রঙ্গিলা, 'সুবাসীর উপরই তোমার মন আছে। সুবাসীর কথা তো ভাব, আমার কথা কি একবারও ভাবছ ! আমার কী হইব !'

অস্ফুট গলায় অনঙ্গ কি বলে, বোঝা যায় না।

রঙ্গিলা বলতে থাকে, 'সুবাসীর পিরীতেই মজলা পুরুষ ! আমার পিরীত মনে বুঝি দাগ কাটে না !'

বলতে বলতে কেঁদে ফেলে রঙ্গিলা। টস টস করে তার চোখ থেকে লোনা জল ঝরতে থাকে।

বিব্রত, বিমূঢ় অনঙ্গ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপব রঙ্গিলার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, 'অমুন কইরা কাইন্দো (কেঁদো) না ঢালীর মাইয়া। কান্‌লে (কাঁদলে) আমি দিশাহাবা হইয়া যাই। দুইটা দিন ভাবতে দাও। দেখি কি করতে পারি।'

মান্দার গাছের আড়াল থেকে দেখতে দেখতে পলক পড়ে না সুবাসীর। শরীরটা থরথর করছে। পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। চোখের সামনের নদীটা যেন দুলছে।

মাথাটা টলছে। বুকরে ভিতর অবুঝ, অসহ্য এক ব্যথা। সব দেখে শুনেও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না সুবাসী।

কেন এমন হয়।

হঠাৎ শরীবের সবটুকু জোর গলায় ঢেলে সুবাসী চেঁচিযে উঠল, 'সই—'

অনঙ্গ আর রঙ্গিলা চমকে উঠল।

মান্দার গাছেব আড়াল থেকে সুবাসী বেবিয়ে এল। বলল, 'তোব মনে এই আছিল সই! এব লেইগা (জন্য) তোব কাছে মনেব কথা খুইলা কইছিলাম। তুই আমাব সই না, শত্তুব। বাক্ষসী! এমুন বিশ্বাসঘাতী তুই!'

বলতে বলতে তিল-কলাইব ক্ষেতেব উপব দিয়ে মালীপাড়াব দিকে ছুটল সুবাসী।

এবপর তুই সখিব সখিত্ব ঘুচল। তু-জনেব মধ্যে কথা বন্ধ হল। দেখা হলেই তু-জনে তু-দিকে মুখ ঘুবিযে চলে যায়।

সুবাসী আর বঙ্গিলা—এতকাল তু-জনে মিলে একটা অখণ্ড সত্তা ছিল। প্রাণেব এমন কথা নেই, যা একজন আবেকজনকে না বলত। একজনের ইচ্ছার সঙ্গে আবেকজনেব ইচ্ছাব এতটুকু তফাত ছিল না।

সুখ-তুঃখ, হাসি-কান্না—তুজনে সমান অংশে ভাগ কবে নিত।

তু-জনেব মাঝখানে ছিল অগাধ বিশ্বাস, প্রচুব ভালবাসা আব অফুবন্ত প্রীতি।

কিন্তু অনঙ্গ নামে এক পুরুষ তুই সখির মধ্যে অলক্ষ্যে চিড় ধবিয়েছে।

এখন কেউ কারুকে বিশ্বাস কবে না। তুজনেব মাঝখানে এখন অন্ধ বিদ্বেষ আব অবিশ্বাস, আর অনঙ্গকে নিয়ে কুৎসিত এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

॥ বিশ ॥

আজ সুবাসীর পাকা দেখা।

বাজিতপুর থেকে বুড়ো মালী এসেছে। লখাইচাঁদ এসেছে। তাদের সঙ্গে আরো জনকতক এসেছে।

বৈশাখ মাসে বিয়ে। বিয়ে যখন হয় হবে। আগে থেকেই বুড়ো মালী কথাবার্তা পাকা করে রাখছে। সুবাসীকে তাদের খুব পছন্দ।

কথায় বলে মেয়ের বাপের মন। সব সময় টলোমলো। দিনরাত অকারণ ভয়ে সে অস্থির। পাকা কথা না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সে ভরসা পায় না।

এটা ফাল্গুন মাস। সেই বৈশাখে বিয়ে। মাঝখানে পুরো দুটো মাস। কিছু বলা যায় না, এর মধ্যে অন্য জায়গা থেকে যদি সম্বন্ধ আসে চন্দ্র মালী হয়ত মেয়ের বিয়ে দিয়ে বসবে। তাই বুড়ো মালী এখনই পাকা দেখা সেরে রাখছে।

চন্দ্র মালী বারান্দায় ধবধবে ফরাস পেতে দিয়েছে। বাজিতপুরের মালীরা তার উপর জাঁকিয়ে বসেছে। হাতে হাতে হুঁকো ঘুরছে। দা-কাটা তামাকের কড়া গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

এখন দুপুর।

যতদূর তাকানো যায় আকাশটা ঝলসে যাচ্ছে। একঝাঁক বালিহাঁস উড়তে উড়তে ধলেশ্বরীর দিকে চলেছে। চন্দ্র মালীর বারান্দা থেকে অনেক দূরের নদীটাকে রূপার হাঁসুলীর মত দেখাচ্ছে।

কুঞ্জ ছাড়া সবাই এসেছে। চন্দ্রর উঠানে সমস্ত মালীপাড়াটা ভেঙে পড়েছে।

হুঁকোতে লম্বা একটা টান মারল বুড়ো মালী। নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর ডাকল, 'মালীর পুত—'

ফরাসেব একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল চন্দ্র। পান-তামাক, কাব কি দরকার, সব এগিয়ে দিচ্ছিল। আপ্যায়নে যাতে ত্রুটি না হয়, লক্ষ্য রাখছিল। বুড়ো মালীর ডাক কানে যেতেই সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'ডাকলেন?'

'হ।'

বুড়ো মালী বলল, 'এইবার মাইয়া আন। সূর্য মাথাব উপব আসিলেই কিন্তুক লগ্ন। এই লগ্নেই পাকা দেখা সাবতে হইব।'

'হ-হ,—আনতে আছি—'

বলেই ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকল চন্দ্র মালী।

ঘরের ভিতর মালীপাড়ার বৌ-ঝিরা ভিড় কবে আছে। চনমন করে চারদিক তাকাল চন্দ্র। কিন্তু না, সুবাসী কি ত'র মাকে কোথাও দেখা গেল না। বৌ-ঝিদের উদ্দেশ করে চন্দ্র মালী বলল, 'সুবাসী কই?'

ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলল, 'নয়া ঘরে।'

এই ঘরটার ঠিক পাশেই আরেকখানা ঘর। ঘবটা নতুন। উপরে ঢেউটিনের চাল, চারপাশে ক্যাঁচা বাঁশের বেড়া, নিচে কাঠের পাটাতন।

তাড়াতাড়ি নতুন ঘরে গিয়ে ঢুকল চন্দ্র মালী।

সুবাসী আর তার মা ছাড়া নতুন ঘরে কেউ নেই।

দু-হাতে মুখ ঢেকে এক কোণে বসে আছে সুবাসী। মাথাব চুল আলুথালু। পরণের কাপড় এলোমেলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। কান্নার দমকে তাব সুঠাম দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সুবাসীর মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

চন্দ্র মালী কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'এই কি বউ, অখনও খাড়ইয়া (দাঁড়িয়ে) আছিস—'

নির্বিকার মুখে সুবাসীর মা বলল, 'কি করুম ?'

'কি করবি ?'

অবাক চোখে কিছুক্ষণ সুবাসীর মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল চন্দ্র। তারপর শুরু করল, 'আইজ মাইয়ার পাকা দেখা, সেই খেয়াল আছে ?'

'আছে।' শান্ত গলায় জবাব দিল সুবাসীর মা।

'খেয়াল আছে তো, অখনও মাইয়ারে সাজাস নাই ক্যান ?'

'মাইয়া না সাজলে কি করুম ?'

সুবাসীর মা বলতে লাগল, 'কখন থিকা কইতে আছি, সাজাইয়া দি। মাইয়া খালি কান্দে (কাঁদে)।'

এবার সুবাসীর পাশে গিয়ে বসল চন্দ্র মালী। আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সস্নেহ, নরম গলায় বলল, 'কান্দিস (কাঁদিস) না মা, কান্দিস না। যা, জামা-কাপড় পইরা নে—'

মুখ থেকে হাত সরাল সুবাসী। গালের উপর চোখের জলের দাগ পড়েছে। কান্নাভরা, ধরা-ধরা গলায় সে বলল, 'আমি তোমাগ (তোমাদের) কী করছি, যে পর কইরা দিতে আছ।'

ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সুবাসী।

গাঢ় গলায় চন্দ্র বলল, 'তুই বড় হইছিস, সগলই তো বুঝিস মা। মাইয়া বড় হইলে বিয়া দিতে হয়, পরের ঘরে পাঠাইতে হয়। এই হইল পিরথিমীর নিয়ম।'

একটু থেমে আবার, 'তোরে পরের ঘরে পাঠামু। দুঃখে বুক আমার ফাইটা যায়। কিন্তুক কি করুম মা। এই যে রীতি—'

বলতে বলতে অসহ্য আবেগে চন্দ্র মালীর গলাটা বুঁজে গেল।

অবুঝের মত মাথা নাড়তে লাগল সুবাসী। বলতে লাগল, 'না-না, আমারে পর কইরা দিও না।'

মেয়েকে আর কিছু বলল না চন্দ্রমালী। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। সুবাসীর মায়ের কাছে এসে বলল, 'মাইয়ারে সাজাইয়া রাখ। এট্টু পরে আইসা নিয়া যামু।'

চন্দ্র মালী বাইরে চলে গেল।

সুবাসীর মা মেয়ের কাছে এল। তার একটা হাত ধরে বলল, 'আয় মা, আয়। দেরি হইয়া যাইতে আছে। লগ্ন বইয়া গেলে আইজ আর পাকা দেখা হইব না।'

সুবাসী কিছু বলল না।

সুবাসীর মা আবার ডাকল, 'আয়—'

দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বসে রইল সুবাসী। উঠবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

এবার মেয়ের পাশে বসে পড়ল সুবাসীর মা। হাঁটুর ফাঁক থেকে জোর করে তার মুখটা তুলে ধরল।

ঘন পালকে ঘেরা চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে লাল করে ফেলেছে সুবাসী। ঠোঁট দুটো ফোলা ফোলা। গালে চোখের জলের দাগ। কয়েক গাছা উড়ু উড়ু রুক্ষ চুল গালে-গলায় জড়িয়ে রয়েছে।

তীক্ষ্ণ, সন্ধানী চোখে অনেকক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুবাসীর মা। কি দেখল, কি বুঝল সে-ই জানে। ফিস ফিস গলায় ডাকল, 'সুবাসী—'

মায়ের গলার স্বরে এমন কিছু আছে, যাতে সুবাসী চমকে উঠল। বলল, 'কী কও মা—'

'তোর ইচ্ছাটা কী?'

'কিসের ইচ্ছা?'

সঙ্গে সঙ্গেই কথাটার জবাব দিল না সুবাসীর মা। কি একটু যেন ভাবল। মেয়ের মুখের উপর দৃষ্টিটা স্থির রেখে শুধলো, 'এই সম্বন্ধ তোর পছন্দ হয় নাই?'

সুবাসী চুপ।

সুবাসীর মা বলল, 'কথা কইস না ক্যান?'

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল সুবাসী। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল।

সুবাসীর মা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, 'কী হইল? শুধাশুধি কান্দিস ক্যান?'

তার স্বরে যত না বিস্ময় তত বিরক্তি।

মেয়ে বড় হলে বিয়ে হয়, পরের ঘরে চলে যায়। এই হল জগতের নিয়ম। এই হল সংসারের রীতি। চিরকাল কেউ বাপের ঘরে থাকে না। পরের ঘরে যাবার জন্যই তো মেয়েমানুষের জন্ম। সব মেয়েই তা জানে।

বাপ-মাকে ছেড়ে যেতে মেয়ের কষ্ট হয়, দুঃখে বুক ফেটে যায়। কথাটা ঠিক। সুবাসীর মা ভাবল, তাদেরও একদিন বিয়ে হয়েছে। বাপ-মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে আসতে বুক ফেটে গিয়েছে।

কথায় বলে, নিজেকে দিয়ে জগৎ দেখা। বেশ বয়স হয়েছে সুবাসীর মায়ের। নিজের মন নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে আর দশজনের কথা জেনেছে সে। বিয়ের আগেই মেয়েরা কাঁদে। বিয়ের পর মা-বাপের প্রতি মেয়েদের কত টান থাকে, তার জানা আছে। তখন নিজের সংসার, নিজের স্বামী, নিজের ছেলেপুলে নিয়ে সবাই ঝালাপালা। তখন বাপ বল, মা বল, কোনদিকেই কি লক্ষ্য থাকে!

এই যে সুবাসী এত কাঁদছে, বিয়ের পর বাপ-মায়ের জন্যে তার প্রাণে কত সোহাগ থাকে, দেখা যাবে!

মায়ের বুকে মুখ রেখে সমানে কাঁদছে সুবাসী।

প্রথম প্রথম সুবাসীর মার মনে হয়েছিল, বিয়ের কথায় সবাই যেমন কাঁদে, সুবাসীও বুঝি তেমনি কাদছে। কিন্তু এখন তার মনটা কেমন যেন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। একদৃষ্টে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়েকে দেখছে সে। সুবাসীর কান্নাটা বাড়াবাড়ি রকমের মনে হচ্ছে।

মেয়েকে আস্তে একটা ঠেলা দিল সুবাসীর মা। বলল, 'উইঠা বস্।'

মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে একপাশে বসল সুবাসী।

সুবাসীর মা আবার বলল, 'কী হইছে তোর?'

অস্থির, কাঁপা-কাঁপা গলায় সুবাসী বলল, 'এইখানে আমার বিয়া দিও না মা।'

ঠিক এই সময় চন্দ্র মালী ঘরে ঢুকল। বিরক্ত, ব্যস্ত গলায় বলল, 'তোরা মায়-ঝিয়ে এখনও বইসা আছিস? তরাতরি কর বউ। আর কিন্তুক সময় নাই।'

বলেই বেরিয়ে গেল সে।

সুবাসীর মা মেয়েকে নিয়ে পড়ল। বলল, 'এইখানে বিয়া দিমু না?'

'না।'

'তোর ইচ্ছাটা কী?'

সুবাসী জবাব দিল না।

'কি, চুপ কইরা রইলি যে?'

দু-হাতে মুখ ঢেকে অস্ফুট গলায় সুবাসী বলল, 'মাগো, অলঙ্গরে আমি—'

কথাটা শেষ করল না সুবাসী।

'অলঙ্গ!'

সুবাসীর মায়ের গলাটা চমকে উঠল।

একটু চুপ।

অদ্ভুত এক বিস্ময় সুবাসীর মাকে বোবা করে ফেলেছে। বলে কি মেয়েটা! নিজের কানদুটোকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

অনঙ্গ!

অনঙ্গ যে তার মেয়ের সাধের মানুষ হয়ে আছে, এ-কথাটা তো কোনদিন ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি সুবাসীর মা। মেয়ের এত কান্না, এত চোখের জল সবই তা হলে সাধের মানুষের জন্য! বাপ-মায়ের জন্য না।

কি করবে, কি বলবে, বুঝে উঠতে পারছে না সুবাসীর মা। কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছে।

চন্দ্রমালী আবার এল। তাঁতের মাকুর মত একবার ঘর একবার বার করছে সে।

ঘরে ঢুকে চন্দ্র দেখল, মা আর মেয়ে চুপচাপ বসে আছে। দেখে রেগে গেল সে। শুধলো, 'তোগো (তোদের) মতলবখান কী?'

স্বামীকে দেখে বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেল। সুবাসীর মা বলল, 'কিসের মতলব?'

'কিসের মতলব, তোরাই জানস্।'

চন্দ্র ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'অখনও মাইয়া সাজাস নাই! উইদিকে পাকা দেখার লগ্ন যায় যায়। লগ্ন পার হইয়া গেলে নয়া কুটুমগো কাছে মুখ দেখামু কেমনে?'

'মুখ আর দেখাইতে হইব না।'

সুবাসীর মায়ের মুখে বিচিত্র একটু হাসি ফুটল।

চন্দ্রমালী চমকে উঠল। বলল, 'হইচে কী?'

'হইচে আমার কপাল।'

সুবাসীর মা কেঁদে ফেলল।

হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চন্দ্রমালী। তারপর বলল, 'কী কইস, কিছুই যে বুঝি না।'

'আ গো পুরুষ, তুমি কেমুন মানুষ! সব্বনাশ হইয়া গেছে, তা-ও বোঝ না!' সুবাসীর মা বলতে লাগল, 'গুণবতী মাইয়া কি করছে জান?'

'কী?'

চন্দ্রমালীর চোখে আশঙ্কার ছায়া পড়ল।

'মাইয়া বড় হইচে। সগল বুঝতে শিখছে। তোমারে কতদিন ধইরা কইতে আছি, বিয়া দাও বিয়া দাও। তোমার কি গরজ আছে!'

সুবাসীর মা বলতে লাগল, 'ছোট বয়সে বিয়া হইলে কি এই বিপদ হইত!'

'প্যানপ্যানানি রাখ বউ।'

উদ্বিগ্ন গলায় চন্দ্রমালী বলল, 'মাইয়া কী করছে, তাই ক' (বল)।'

মুখ ঢেকে একপাশে বসে আছে সুবাসী। মেয়ের দিকে একবার তাকাল সুবাসীর মা। তারপর স্বামীর কাছে এল। চন্দ্রর কানে মুখ রেখে ফিস ফিস গলায় বলল, 'মাইয়া তো অলঙ্গরে ছাড়া কারোরে বিয়া করতে চায় না।'

'ক্যান?'

'ক্যান, বোঝো না?'

আভাষে, ইসারায় অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল সুবাসীর মা।

'সব্বনাশ! এই কথা আগে কইস নাই ক্যান?'

'আগে কি জানতাম! এই তো শুনলাম।'

'তা হইলে উপায়!'

ভীরু গলায় চন্দ্রমালী বলল, 'মাইয়া যদি পাকা দেখার আসরে না যায়, মুখে চুনকালি পড়ব, মাথা কাটা যাইব।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। কেউ কথা বলছে না। না সুবাসী, না চন্দ্রমালী, না সুবাসীর মা।

হঠাৎ ক্ষেপে উঠল চন্দ্রমালী। 'না-না, কোন কথা আমি শুনুম না। যাইচা (যেচে) গিয়া বাজিতপুরের সম্বন্ধ করছি। তারা আইজ পাকা দেখতে আসছে। অখন অলঙ্গর কথা কইলে কী হইব!'

'কিন্তুক—'

সুবাসীর মা কি যেন বলতে চাইল। হয়ত সে ভেবেছে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিলে মেয়ে সুখী হবে না। সাধের মানুষকে না পাওয়ার দুঃখে, আক্ষেপে সুবাসী কী করে বসবে, কে জানে।

চন্দ্রমালী রুখে উঠল, 'কথা যখন হইয়া গেছে, বিয়া এইখানেই দিমু।'

সুবাসীর কাছে গিয়ে বলল, 'আয় আমার লগে (সঙ্গে)—'

বাপের মারমুখী চেহারা দেখে সুবাসী ভয় পেয়ে গেল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। চন্দ্রমালী মেয়ের হাত ধরল।

সুবাসীর মা শুধলো, 'কোথায় নিয়া যাও সুবাসীরে?'

'পাকা দেখার আসরে।'

'খাড়ও (দাঁড়াও)।'

'ক্যান ?'

'সুবাসীরে সাজাইয়া দি।'

'আর সাজের দরকার নাই।'

সুবাসীকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল চন্দ্র মালী।

পা দুটো জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। টলছে। ঠিকমত হাঁটতে পারছে না সুবাসী। শরীরটা থরথর করছে। বুকের ভিতর থেকে একটা অসহ্য কাঁপুনির বেগ উঠে আসছে। কিছুতেই তাকে সামলানো যাচ্ছে না।

সূর্য মাথার উপরে এসেছে। রোদটা খাড়াভাবে পড়ছে। আকাশটা ঝকঝক করছে।

নতুন ঘরের পাশেই খড়ের চালের একখানা পুরনো ঘর. তার বারান্দায় বাজিতপুরের বুড়ো মালারা বসে আছে।

ফাল্গুনের আকাশ, রোদ, বুড়ো মালী—কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না সুবাসী। সব আবছা হয়ে যাচ্ছে।

খুব আস্তে একবার চন্দ্র মালীকে ডাকল সুবাসী, 'বাবা—'

ডাকল কিন্তু গলায় স্বর ফুটলো না। চন্দ্র শুনতে পেল না।

মাথার ভিতরে হাজারটা ঝিঝি ডেকে উঠল। শরীরটা ঝিমঝিম করছে। দু-হাত বাড়িয়ে বাপকে ধরতে চাইল সুবাসী। পারল না।

একসময় চোখের সামনে ফাল্গুনের দুপুরটা অন্ধকার হয়ে গেল। রোদ নিভে গেল। সুবাসীর মনে হল, সে পড়ে যাচ্ছে।

পাকা দেখার আসর পর্যন্ত মেয়েকে নিয়ে যেতে পারল চন্দ্র মালী।

এখন কত রাত, কে জানে।

ঝিরঝির একটু বাতাস দিয়েছে। বাতাসে শীতের আমেজ মিশে আছে। অল্প অল্প কুয়াশা পড়েছে।

ফাল্গুন মাসের স্বভাবই এই। দিনে অসহ্য তাপ। রাত্তিরটা হিম-হিম, ঠাণ্ডা।

জানলার ফাঁক দিয়ে চন্দনের পাটার মত গোল একটি চাঁদ দেখা দিয়েছে। কুয়াশায় ভিজে ভিজে চাঁদটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

বাইবেব দিকে তাকিয়ে আছে সুবাসী। স্নায়ুগুলো খুব দুর্বল। মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে। তবু টুকরো টুকরো কয়েকটা ছবি সে মনে করতে পারল।

মনে পড়ছে, পাকা দেখার আসরের দিকে যেতে যেতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। কখন তাব জ্ঞান ফিরেছে, সুবাসী জানে না। জ্ঞান হবার পর সে দেখেছে, এই বিছানাটায় শুয়ে আছে।

বেহুঁশ অবস্থায় কি তাব পাকা দেখা হয়ে গিয়েছে? সুবাসী ভাবতে চেষ্টা কবল। একবাব মনে হল, হয়েছে। আবার মনে হল, হয়ত হয় নি।

যদি হয়ে গিয়ে থাকে?

তা হলে এ জন্মের মত অনঙ্গকে পাওয়ার আশা নেই।

চারপাশে একবাব তাকাল সুবাসী। ঘরের ভিতর কেউ নেই। মা না, বাপ না, কেউ না।

সুবাসী কেঁদে ফেলল। চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরতে লাগল।

সাধ মিটিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল সুবাসী। সে শুনেছে, কাঁদলে বুক হাল্কা হয়ে যায়। সব দুঃখ গলে গলে চোখের জল হয়ে বেরিয়ে যায়।

সব মিথ্যে। এত কাঁদল সে, কই বুক তো হাল্কা হচ্ছে না।

এখন এমন একজন কেউ যদি থাকত যার কাছে দুঃখের কথা বলে সে জুড়াতে পারত। হঠাৎ রঙ্গিলার কথা মনে পড়ল সুবাসীর।

রঙ্গিলা! তার সই!

এক মূহূর্ত সইয়ের কথা ভাবল সুবাসী। দাঁতে দাঁত চাপল। গলায় রীষ ঢেলে বিড় বিড় করে বলল, 'সই না, ও আমার শত্তুর!'

না, প্রাণের কথা বলার মত একটা মানুষ পৃথিবীর কোথাও বুঝি নেই। এতদিন রঙ্গিলা ছিল।

রঙ্গিলার কাছে গিয়ে আর কোন লাভ নেই। সেও অনঙ্গর ভাগীদার। অনঙ্গকে সে তাব কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

সুবাসী মনে মনে বলল, 'আমি তো বাজিতপুরে চললাম। বাপে ঐখানেই আমার বিয়া দিব। রাক্ষসী, তোর অখন কত সুযুগ, কত সুবিধা। অলঙ্গরে তুই-ই নে, তুই-ই খা।'

ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সুবাসী।

॥ একুশ ॥

এখন বিকাল।

কাঁখে কলসী নিয়ে নদীর ঘাটে এসেছে সুবাসী। ঘাটটা একেবারে ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই।

কলসী নামিয়ে একপাশে বসে পড়ল সে।

ষষ্ঠ ঋতুর আকাশটা এই পড়ন্ত বেলায় ময়ূরের মত পেখম মেলে আছে। লাল-নীল-হলুদ—রঙে রঙে বেলাশেষের বাহার খুলেছে।

অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সুবাসী।

এখন জোয়ার আর ভাটির মাঝামাঝি সময়। নদীতে ঢল নেই, বেগ নেই। নদী এখন অলস, মন্থর, ক্লান্তগতি। সুবাসী জানত না, একটা ভাবুক মাছরাঙা খানিকটা দূরের মান্দার গাছগুলির মাথায় বসে ছিল। হঠাৎ নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাখিটা। ঝুপ করে একটা শব্দ হল।

ঘুরে বসল সুবাসী।

এর মধ্যে মাছরাঙাটা ছোট একটা চাঁদা মাছ মুখে নিয়ে আবার মান্দার গাছের মাথায় এসে বসেছে।

একটুক্ষণ মাছরাঙাটাকে দেখল সুবাসী। তারপর মান্দার গাছগুলির দিকে তাকাল। অজস্র ফুল ফুটেছে। টকটকে লাল ফুল। মান্দার গাছগুলির মাথায় যেন আগুন ধরে গিয়েছে।

মাছরাঙা, লাল ফুল, মান্দার গাছ—কিছুই ভাবছে না সুবাসী।

এই মুহূর্তে একটা কথা মনে পড়েছে তার। ক-দিন আগে এই মান্দার গাছগুলির তলায় অনঙ্গর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

অনঙ্গ!

অনঙ্গর কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা কেঁপে উঠল। বুকের গভীর থেকে একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস উঠে এল।

নাঃ, অনঙ্গকে এ জীবনে পাওয়া যাবে না। তাকে পাওয়ার আশা নেহাতই দুরাশা। পাকা দেখার দিন সে অজ্ঞান হয়েছিল। তবু বাপ জেদ ধরে আছে, বাজিতপুরেই তার বিয়ে দেবে। সুবাসীর অদৃষ্টে কী আছে, কে জানে।

একদৃষ্টে মান্দার গাছগুলির দিকে তাকিয়ে বসে রইল সুবাসী। উপরে ষষ্ঠ ঋতুর রংবাহারি আকাশটা মাথা কুটে মরতে লাগল। সেদিকে ফিরেও চাইল না সে। অথৈ এক দুঃখ বুকের ভিতর ফুলে উঠতে লাগল।

কতক্ষণ বসেছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ সুবাসীর মনে হল, কে যেন ঘাটের দিকে আসছে।

পিছন ফিরে তাকাল সুবাসী। তাকিয়েই চমকে উঠল। কলসী কাখে রঙ্গিলা আসছে।

কাছাকাছি আসতেই দু-জনেব চোখাচোখি হল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রঙ্গিলা।

অনেকদিন পর নদীর ঘাটে দুই সইয়ের দেখা হল।

রঙ্গিলা আর সুবাসী—অনেকটা সময় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একটু একটু করে দু-জনের দৃষ্টি তীব্র ক্রুর আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। দু-জোড়া চোখ জ্বলছে। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে দুজনে। দুটো বুক দ্রুতবহ শ্বাসের উত্তেজনায় ওঠানামা করছে। কেউ কথা বলছে না।

মনে হয়, দুটি ভয়ানক প্রতিপক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

একদিন এই ধলেশ্বরী সাক্ষী রেখে তারা সই হয়েছিল। প্রতিজ্ঞা

করেছিল, একজনের সুখে আরেকজন সুখী হবে! একজনের দুঃখে অন্য জন দুঃখী। সুখ-দুঃখ—সব কিছু সমান অংশে ভাগ করে নেবে।

কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের দেখলে, কে বলবে তারা দুজনে সই।

এক সময় চোখ নামিয়ে নদীতে গিয়ে নামল রঙ্গিলা। কলসীতে জল ভরল।

এবার কিন্তু সুবাসী রঙ্গিলার দিকে তাকাল না। মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। বিড় বিড় করে বলল, 'রাক্ষসী, সব্বনাশী—'

রঙ্গিলা রুখে দাঁড়াল। বলল, 'কী কইলি?'

সাঁ করে ঘুরে বসল সুবাসী। বলল, 'যা কইলাম ঠিকই কইলাম।'

একটু চুপ।

এবার রঙ্গিলা শুধলো, 'আমি তোর কোন সব্বনাশটা করছি?'

সুবাসী চিরকালের শান্ত মেয়ে। হঠাৎ সে ফুঁসে উঠল, 'নিজের মনেরে জিগা (জিজ্ঞাস কর), কোন সব্বনাশটা আমার করস নাই? আমার সব আশায় তুই ছাই দিছস। আমার ভরা ভোগ তুই কাইড়া নিছস।'

'থাম্ মাগী, থাম্—'

রঙ্গিলার চোখ দুটো ধক্‌ধক্ করছে। চাপা, তীক্ষ্ণ গলায় সে বলতে লাগল, 'আমি যুবতী মাইয়া, আমার মনে সাধ-আহ্লাদ নাই? ক্ষ্যামতা থাকলে তুই অলঙ্গরে নে—'

'তুই-ই তারে নে। পাপিষ্ঠিনী, তুই-ই তারে খা।'

একটু থেমে সুবাসী আবার বলল, 'আমার দরকার নাই।'

রঙ্গিলা হয়ত কিছু বলত। তার আগেই মাঝিঘাটা থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'এই গো মাইয়ারা, শোন দেখি—'

রঙ্গিলা আর সুবাসী চমকে উঠল।

দুজনে যখন পরস্পরের প্রতি রুখে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় তাদের অলক্ষ্যে একটা নৌকা মাঝিঘাটায় এসে ভিড়েছে।

অবাক হয়ে সুবাসীরা দেখল, একজন সওয়ারী নৌকা থেকে নেমে

দাঁড়িয়েছে। চোখাচোখি হতেই পায়ে পায়ে সে তাদের দিকে এগুতে লাগল।

বেশ বয়স হয়েছে লোকটার। চুল পাকতে শুরু করেছে। তবু সারা দেহে কোথাও বয়সের ছাপ পড়ে নি। চামড়া এতটুকু কোঁচকায় নি। শরীরের বাঁধুনি অটুট, মজবুত। পাকা আমের মত টসটসে, নরম মুখখানায় মধুর একটি হাসি লেগে আছে।

সারা দেহে তার রসকলি। বুকে সাদা চন্দনের কৃষ্ণপদছাপ। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা।

কাছে এসে লোকটা শুধলো, 'সুজন মাঝির বাড়ি কোনদিকে, কইতে পার?'

রঙ্গিলা সুজনের বাড়ির পথ বলে দিল।

লোকটা চলে গেল।

এবার রঙ্গিলা তাকাল সুবাসীর দিকে। দেখল, সুবাসীও তার দিকেই তাকিয়ে আছে। একটু আগের রেষারেষির কথা তারা ভুলে গিয়েছে। দুজনের চোখেমুখে একই কৌতূহল ফুটে বেরিয়েছে। এই মাত্র যে লোকটা সুজন মাঝির বাড়ির দিকে গেল, সে কে! কোথা থেকে কি দরকারে সে এসেছে?

প্রশ্নটা মনেই থেকে গেল। মুখ ফুটে কেউ কারুকে জিজ্ঞেস করতে পারল না।

একসময় জল ভরে যে যার বাড়ির দিকে চলে গেল।

যে ময়ূরটা এতক্ষণ আকাশে পেখম মেলে ছিল, এবার সে ডানা মুড়তে শুরু করছে। এখন চারপাশ ছাই-ছাই, আবছা-আবছা।

একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে।

॥ বাইশ ॥

সুজন মাঝির মনে সেই যে কু-ডাক উঠেছিল, শেষ পর্যন্ত তা সত্যি হল। সুরূপনগর থেকে ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে ব্রজবাসী এসেছে।

ব্রজবাসী সুরূপনগর হরিসভার বড় বৈষ্ণব, মহান্ত। তার আদি নাম অক্রুর ভুঁইমালী। কিন্তু বার দুই ব্রজধাম বৃন্দাবনে ঘুরে আসার পর তার নাম হয়েছে ব্রজবাসী। ব্রজবাসী নামের আড়ালে তার আসল নামটা হারিয়ে গিয়েছে।

সুজন মাঝির বাড়ি এল ব্রজবাসী। দিন দুই থাকার পর বলল, 'বুঝলা সুজন, আমার বয়স হইছে।'

'আইজ্ঞা—'

কিছুক্ষণ সুজন মাঝিব মুখেব দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখল ব্রজবাসী। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'মানুষ চিবকাল থাকে না। আমিও একদিন এই পিরথীমিতে থাকুম না। মরার আগে মনের একখান সাধ মিটাইতে চাই মাঝি।'

'কী সাধ?'

'আমি সুরূপনগর হরিসভার মহান্ত। আমার পর অনঙ্গরে মহান্ত করতে চাই।'

অস্ফুট গলায় সুজন মাঝি বলল, 'ভাল কথা—'

খানিকটা চুপচাপ।

একসময় ব্রজবাসী বলল, 'অনঙ্গরে আমি নিয়া যাইতে আসছি।

'কিন্তুক—'

মুহূর্তে চোখের সামনে পৃথিবীটা শূন্য হয়ে গেল। বুকের ভিতর কোথায় যেন একটা হাহাকার বাজতে লাগল। করুণ গলায় সুজন মাঝি বলল, 'কিন্তুক অলঙ্গ চইলা গেলে আমি কি নিয়া থাকুম বড় বৈষ্টম!'

'তুমি কি সেই কথা ভুইলা গেছ মাঝি?'

'কোন কথা?'

'অনঙ্গরে যখন তোমার হাতে দি, সেই সময় যে কথা হইছিল।'

'সে কথা ভুলি নাই, বড় বৈষ্টম। কিন্তুক মন যে মানে না।'

অবুঝ, আকুল হয়ে কাঁদে সুজন মাঝি। তার মাঝিনীও কাঁদে।

অনঙ্গকে সোনারঙ নিয়ে আসার আগে একটু কথা আছে।

সুজন মাঝি প্রায়ই স্বরূপনগরের হরিসভায় যেত। বুড়ো বয়স পর্যন্ত ছেলেপুলে হয় নি সুজনের। ছেলেপুলের জন্য তার বড় দুঃখ, বড় আক্ষেপ। এই দুঃখ আব আক্ষেপের কথা জানত ব্রজবাসী।

ব্রজবাসীর মনে বুঝি বা করুণাই হয়ে থাকবে। একদিন অনঙ্গকে সুজনেব হাতে তুলে দিয়ে সে বলেছিল, 'এরে তুমি নিয়া যাও সুজন। নিজের সন্তানের মত দেইখো। কিন্তুক একটা কথা। যখনই আমার প্রয়োজন হইব, অনঙ্গরে ফিরাইয়া দিতে হইব।'

আজ অনঙ্গকে ব্রজবাসীর প্রয়োজন। তিন বছর সন্তান-সুখ ভোগেব পর এমন করে দুঃখ আসবে, তা কি কোন দিন ভাবতে পেরেছিল সুজন মাঝি?

অনঙ্গকে ছেড়ে দিতে বুক ফেটে যাচ্ছে। সুজন মাঝি আর তার মাঝিনী মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল।

কান্না, দুঃখ, হাহাকার—কোন কিছুতেই টলানো গেল না। বিকালে অনঙ্গকে নিয়ে জিরানিয়া ঘাটে এল ব্রজবাসী।

তিন বছর আগে সুজন মাঝির সঙ্গে এই ঘাটে এসে নেমেছিল অনঙ্গ। তিন বছর পর এই ঘাটেই ব্রজবাসীর সঙ্গে নৌকায় উঠল। সেবার পাড়ি জমিয়েছিল স্বরূপনগর থেকে সোনারঙে। এবার সোনারঙ থেকে স্বরূপনগরে।

নদীর ওপার আর এপার। এপার আর ওপার। এই বুঝি অনঙ্গর জীবন।

নদীর পারে দাঁড়িয়ে সুজন মাঝি আর তার মাঝিনী চোখ মুছছে।

মালীপাড়া, ঢালীপাড়া, নিকারীপাড়া, কুমারপাড়া—সোনারঙ গ্রামের সবাই এসেছে উজানিয়া ঘাটে। কেউ কথা বলছে না। তাদের মুখগুলি বড় করুণ, বড় ব্যথাতুর দেখাচ্ছে।

ধলেশ্বরীর পশ্চিম পারে সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। ম্লান, বিষণ্ণ আলো নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে।

একসময় ব্রজবাসীর নৌকা চলতে শুরু করল।

সকলের অলক্ষ্যে দুটি যুবতী মেয়ের চোখে বান ডেকেছে। ব্রজবাসীর নৌকা ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে তাদের চোখে পলক পড়ে না।

একসময় নৌকাটা ধূ-ধূ একটা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল।

নদীর পার থেকে একে একে সবাই গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে। কিন্তু যুবতী মেয়ে দুটি এখনও যায়নি।

আশ্চর্য! কখন যেন তারা পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে।

দুই যুবতী অর্থাৎ সুবাসী আর রঙ্গিলা অনেকদিন পর পরস্পরের হাত ধরল। দুজনের মনে এখন একই ব্যথা বাজছে। একই বেদনা দুটি ভাগে ভাগ করে দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল।

একদিন দুই সই এই ঘাটেই অনঙ্গকে প্রথম দেখেছিল। তিন বছর পর আবার এই ঘাট থেকেই বিদায় দিল।

ধলেশ্বরীর ওপারে সূর্যটা ডুবে গিয়েছে। আবছা সন্ধ্যায় সুবাসী এবং রঙ্গিলাকে অস্পষ্ট দেখায়।

দুই সখির চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে।

ধরা ধরা অস্ফুট স্বরে সুবাসী বলল, 'এই কী হইল সই?'

রঙ্গিলা সেই প্রশ্নটাই কবল, 'এই কী হইল সই?'

অনঙ্গকে পাওয়ার যে সুখ, তা ভাগাভাগি করতে কেউ রাজী ছিল না। কিন্তু অনঙ্গকে না পাওয়াব যে দুঃখ, তার শবিক হতে তাদের আপত্তি নেই।

অন্ধকার গাঢ় হতে থাকে।

ধলেশ্বরী এখন উজানে বইছে।

রসিক সুজনেরা বলে, উজানিয়া নাও, মাতানিয়া নদী।

ধলেশ্বরী কত প্রণয গড়ে, কত প্রণয় ভাঙে। দিবানিশি ঢেউয়ের অক্ষরে দুই তীব বুঝি বা সেই ভাঙাগড়ার কথাই লেখে। চিরদিন দুজ্ঞেয় ভাষায় ভাঙাগড়াব পালাই বুঝি গায়।

নদীব মনে কি আছে, কে জানে।